চিকিৎসা-তত্ত্ব ও ভবৌষধ

বৈদ্যরত্ন
শ্রীযুক্ত কালিদাস বিদ্যাভূষণ
প্রণীত।

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং প্রাণাঃ সংস্থিতিহেতবঃ
তান্নিঘ্নতা কিং ন হতং রক্ষতা কিং ন রক্ষিতং

ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ অভিলাষে যে জন।
প্রাণ তার মূল হেতু বুঝ বিচক্ষণ॥
প্রাণের হইলে নাশ থাকিবে কি আর ?
স্মরণ জীবনাবধি এই কথা সার॥

৮নং রামবাগান ষ্ট্রীট্ স্থিত,
আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যা-মন্দির হইতে
কবিরাজ
শ্রীনরেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।
১৩১৯ সন।

কলিকাতা ২৫নং রায়বাগান ষ্ট্রীট, ভারতমিহির যন্ত্রে,
শ্রীমহেশ্বর ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত।

"চিকিৎসাতত্ত্ব ও ভবৌষধ" সম্বন্ধে

অভিমত।

হিন্দুদিগের গৌরবস্থান ও বঙ্গদেশের মুখপত্র "বঙ্গবাসী" বলেন :—

"চিকিৎসাতত্ত্ব ও ভবৌষধ বৈদ্যরত্ন শ্রীযুক্ত কালিদাস বিদ্যাভূষণ কর্তৃক প্রণীত। কলিকাতা ৮ নং রায়বাগান ষ্ট্রীটস্থিত আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যামন্দির হইতে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ৴০ দুই আনা। গ্রন্থকার সুপ্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক। তিনি সুচিকিৎসক, পরন্তু সুকবি। গীত রচনায় কবিরাজ মহাশয়ের ভাবপ্রাণতার পরিচয় পাইলে, বস্তুতঃই পদে পদে চমৎকৃত হইতে হয়। তাঁহার একটা অসাধারণ শক্তির কথা ভাবিলে বলিতে হয় যে, তাঁহারই তুলনা তিনি। রামপ্রসাদের অনেক গান প্রচারিত আছে ; কিন্তু অনেক গান সম্পূর্ণ নহে। যে সব গান সম্পূর্ণ নহে, আলোচ্য গ্রন্থে সে সব এবং বহু সম্পূর্ণ গান আছে। অসম্পূর্ণ গানগুলিকে গ্রন্থকার সম্পূর্ণ করিয়া দিয়াছেন। গানের কোন গানটা অসম্পূর্ণ ছিল তাহা বুঝিবার যো নাই। কোনখানটা রামপ্রসাদের, আর কোনখানটা গ্রন্থকারের, কবিরাজ মহাশয় তাহা লিখিয়া না দিলে, তাহা বুঝিবার জন্য বস্তুতঃই প্রয়াস পাইতে হয়। রামপ্রসাদের গান ব্যতীত, অন্যান্য কাহারও কাহারও গান আছে। কবিরাজ মহাশয় স্বরচিত কয়েকটী গানও এ গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। এ গ্রন্থে দুইটী বিষয় গদ্যে আলোচিত হইয়াছে। একটীতে চিকিৎসা-তত্ত্ব, আর একটী প্রদত্ত গীতের মাহাত্ম্য। গীত-মাহাত্ম্যই যে ভবৌষধ, গ্রন্থকার সুচিকিৎসক হইলেও, যদি ভাবুক সুকবি না হইতেন তাহা হইলে তাহা বুঝাইতে পারিতেন না। এ গ্রন্থ ঐহিক পারত্রিক জ্ঞানার্জ্জনের সদুপায়। কবিরাজ মহাশয় স্বগুণে গৌরবান্বিত। তাঁহার গুণ-গৌরব আমরা বলিয়া আর কি বাড়াইব ?" "বঙ্গবাসী", ২৯ অগ্রহায়ণ, ১৩১৯ সাল।

বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক-পত্র "হিতবাদী" বলেন :—

"এই পুস্তকে বৈদ্যরত্ন মহাশয় যেমন শারীরিক ব্যাধির প্রতীকার পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেইরূপ সাধকের উক্তিসমূহের ব্যাখ্যা করিয়া ভব-রোগের প্রতীকারেরও পথ দেখাইয়া দিয়াছেন। এরূপ গ্রন্থের প্রচার বাঞ্ছনীয়।" ইত্যাদি। "হিতবাদী", ৫ই পৌষ, ১৩১৯ সাল।

বাহুল্য প্রযুক্ত অন্যান্য সংবাদপত্র ও মনীষীব্যক্তিদিগের অভিমত

পূজ্যপাদ পিতৃদেব বৈদ্যকুল-তিলক

স্বর্গীয় ব্রজমোহন গুপ্ত মহাশয়ের

পবিত্র নামে

এই পুস্তকখানি উৎসর্গীকৃত হইল।

পিতঃ!

আজ ১৯ বৎসর হইল আপনি মোক্ষলাভ করিয়াছেন; তথাপি হৃদয়-পটে আপনার সেই স্থান-গম্ভীর মূর্ত্তি অঙ্কিত রহিয়াছে। আমার ন্যায় পাষণ্ডের মুখেও মহাত্মা **প্রসাদের** সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া আপনার নয়নদ্বয় ভক্তিরসে আপ্লুত হইত। আজ সেই গীতগুলি মালাকারে গ্রন্থন করিয়া সহৃদয় বন্ধুবর্গকে উপহার দিতে যাইতেছি; ইহা আমার পরম সৌভাগ্যের কথা। এ সৌভাগ্য আপনার স্নেহাশীর্ব্বাদের ফল।

সূচিপত্র।

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

"চিকিৎসা-তত্ত্ব ও ভবৌষধ" পুনর্ব্বার যে মুদ্রিত হইবে, এরূপ আশা ছিল না। জগদম্বার কৃপায় পাঁচ হাজার পুস্তক নিঃশেষ হওয়ায় ইহা পুনর্মুদ্রিত করা হইল, কারণ এক্ষণে যাঁহাদের সহিত নূতন পরিচয় বা বন্ধুত্বস্থাপন হইতেছে, তাঁহাদিগের তৃপ্তিসাধনের জন্য হৃদয়ের চিরাঙ্কিত ভাবগুলি প্রকাশ না করিলে মনস্তুষ্টি হয় না, এবং কেবল ভবৌষধে ভব-রোগ দূরীভূত হইলেও সকলকার পক্ষে সাধনার পথ নিরাকরণ হইয়া উঠে না। এজন্য দ্বিতীয় সংস্করণে "সাধনার পথ" নির্দ্ধারণ করিয়া দেওয়া হইল, এবং আরও কতকগুলি সঙ্গীত সংযোজিত করা হইল। সহৃদয় পাঠক মহোদয়গণ ইহাতে তৃপ্তিলাভ করিলে, শ্রম সফল বোধ করিব। অলমতি বিস্তরেণ।

শুভ আশ্বিন, ১৩১৯সাল।
রায়বাগান।

গ্রন্থকারস্য

প্রথম মন্তব্য।

"চিকিৎসা-তত্ত্ব ও ভবৌষধ" অনতিসংক্ষেপে প্রকাশিত হইল। পীড়িত হইয়া চিকিৎসা-তত্ত্ব নিরূপণ করা কঠিন; কারণ ঐ সময়ে দেহের সহিত চিত্তও দুর্ব্বল হইয়া যায়। পূর্ব্বে যদি সহজ শরীরে চিকিৎসা-তত্ত্ব নিরূপণ করা থাকে, তাহা হইলে পীড়ার সময়ে বিপন্ন হইয়া চিকিৎসা বিষয়ে নানা প্রকার লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয় না। আমরা এই অভিপ্রায়ে প্রবন্ধটী প্রকাশ করিলাম। বর্ত্তমান সময়ে কষ্টসাধ্য কোন পীড়া উপস্থিত হইলে কিরূপ চিকিৎসা-বিভ্রাট ঘটিয়া থাকে, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ বিশেষরূপ জানেন। কি জন্য এখন এরূপ বিপত্তি হইতেছে, তাহা সাধ্যানুসারে বুঝাইবার জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা করা গিয়াছে। বিষয়টী গুরুতর, সুতরাং ইহাতে হস্তক্ষেপ করায় দুঃসাহসের কার্য্য হইয়াছে। কিন্তু কোন চিন্তাশীল ব্যক্তির হৃদয় এই বিষয়ে যদি কিঞ্চিন্মাত্র আকৃষ্ট হয়, তাহা হইলেই আমরা শ্রম সফল বোধ করিব। কেবল নীরস বিচার্য্য বিষয় পাঠকগণকে উপহার দিয়া মনের তৃপ্তিলাভ হয় না। এজন্য প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ ভবৌষধ বা (ভব-রোগের আশু প্রতিষেধক) সুধা বিশেষও প্রদত্ত হইল। ভরসা করি, সহৃদয় পাঠক মহোদয়গণ অকিঞ্চনের আকিঞ্চন উপলব্ধি করিয়া প্রীত হইবেন। যেহেতু,—

"মূর্খো বদতি বিষ্ণায় ধীরো বদতি বিষ্ণবে।
দ্বয়োরেব সমং পুণ্যং ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনঃ॥"

দ্বিতীয় মন্তব্য

চিকিৎসা-তত্ত্বে কথা কহিবার অধিকার অনেকের আছে, সুতরাং সে সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিয়াছি, তাহাতে ধৃষ্টতা প্রকাশ পায় নাই। কিন্তু মাদৃশ জনের ভব-রোগের ঔষধ নির্ব্বাচন করিতে যাওয়া বড়ই দুঃসাহসের কার্য্য। যদিও বুঝিতেছি যে, ইহাতে কেবল উপহাসাস্পদ হইতে হইবে, কিন্তু আবার ভরসাস্থলও যথেষ্ট আছে। মূর্খ লোকেরা সুবিজ্ঞ চিকিৎসকের নিকট ঔষধ গ্রহণ করিয়া উৎকট রোগেও সুফল পাইয়া থাকে; সে দাবীতে আমিই বা বঞ্চিত হইব কেন? এই ভরসায় উৎসাহিত হইয়া সিদ্ধপুরুষদিগের গাথা সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হইয়াছি। যদিও মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি মহোদয়গণ মোহমুদ্গরাদি গ্রন্থ প্রণয়ণ করিয়া শান্তি-স্রোতে সকলকে ভাসাইয়া গিয়াছেন, তথাপি মাতৃভাষা-প্রমোদিত ব্যক্তিগণ সুধার সাগর পরিত্যাগ করিয়া, মাতৃস্তন্য-প্রস্রবণে অধিক পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন। আমি এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া মহাজনকৃত পদগুলি ভবৌষধ নামে অভিহিত করিয়াছি। কবিরঞ্জন মহাত্মা রামপ্রসাদ সেন গীতগুলিতে অলৌকিক শক্তির বিকাশ করিয়া, প্রকৃত শক্তিসাধকের পরিচয় দিয়াছেন। ইহা বোধ করি অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন যে, প্রসাদ-সঙ্গীত গীত হইবা মাত্র যুগপৎ জ্ঞান ও ভক্তির আবির্ভাব হইয়া থাকে। যে গীতগুলি শ্রবণ মাত্র দুর্দ্দমনীয় উপসর্গ কামাদি নিবৃত্ত হইয়া যায়, তাহাকে ভবৌষধ ভিন্ন আর কি বলিব?

"প্রসাদ প্রসঙ্গে" যে সমস্ত গীত সন্নিবেশিত হয় নাই এরূপ গীত, আর "প্রসাদ প্রসঙ্গে" যে গীতগুলি অসম্পূর্ণ আছে (সম্পূর্ণ পাওয়া যায় নাই) সে গুলিকে পূরণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহা ব্যতীত অন্য সাধকদিগের কতকগুলি পদ মালাকারে গ্রন্থন করিয়াছি। সকলেই

ইহা অবগত আছেন যে, হীনপ্রভ শিলা উজ্জ্বল মণির সহিত বড়ই শোভা পাইয়া থাকে। আমি এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া স্বকৃত কয়েকটী গীত এই রত্নমালায় সন্নিবেশিত করিয়া বোধ করি কোন অপকর্ম্ম করি নাই। মালাকারের এই মালা ভাবুকবৃন্দ অনুগ্রহ করিয়া স্বকণ্ঠে ধারণ করিলে, শ্রম সফল বোধ করিব। অলমতি বিস্তরেণ।

শ্রীকালিদাস বিদ্যাভূষণ

চিকিৎসা-তত্ত্ব।

নীরোগোদীর্ঘমায়ুশ্চ পুত্রশ্চ প্রিয়ভাজনং।
ভোজ্যং ভোজনশক্তিশ্চ ন চাল্পতপসঃ ফলম্ ॥

অস্যার্থ। নীরোগ হইয়া দীর্ঘ আয়ু লাভ, প্রিয়-ভাজন পুত্র এবং ভোজ্য বস্তু ও ভোজন শক্তি, এইগুলি অল্প তপস্যার ফল নহে।

নীরোগ শরীরে অধিক কাল জীবনধারণ করা বহু পুণ্যের ফল। এখনকার দিনে তাহা দুর্লভ হইয়া উঠিয়াছে। এটী যুগধর্ম্ম হইলেও ইহার কারণ অনুসন্ধান করা, বুদ্ধিমানদিগের একান্ত কর্ত্তব্য। কেন আমরা অল্পায়ু হইলাম? কেনই বা আমাদের সুখ স্বচ্ছন্দতা দিন দিন তিরোহিত হইল? অল্পদিন পূর্ব্বে ভারতবাসী-দিগের শরীর যেরূপ ছিল, এখন আর সেরূপ দেখিতে পাই না কেন?

ইহা বোধ করি অনেকেই অবগত আছেন যে, যাঁহারা যে দেশে বাস করেন, তাঁহাদিগের দেশোপযোগী পদ্ধতিগুলি বংশগত হইয়া যায়; সুতরাং সেই সমস্ত নিয়ম তাঁহাদের পক্ষে হিতকর হইয়া থাকে। ইহা বোধ করি কাহারও অবিদিত নাই যে, ইউরোপবাসিগণ আমাদের দেশে আসিয়াও পূর্ব্বকার অভ্যাসগুলি পরিত্যাগ করেন না। আর ইউরোপীয়গণকে আমরা শিক্ষক বলিয়া স্বীকার করিয়াও তাঁহাদিগের প্রকৃতিগত রীতিগুলি শিক্ষা করিতে যত্নবান্ হইতে পারি না। ইহা যে বিশেষ পরিতাপের বিষয়, তাহাতে আর সন্দেহ কি? যদি আমরা ইউরোপবাসীদিগের গুণগুলি সংগ্রহ করিতে পারিতাম, তাহা হইলে আজ আমাদের এরূপ পরিতাপ করিতে হইত না। বিচার না করিয়া শীতপ্রধান দেশের পদ্ধতিগুলি উষ্ণপ্রধান দেশে পরিচালিত করিয়া আমরা সুখ স্বচ্ছন্দতা নষ্ট করিয়াছি কি না, তাহা কি আমরা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিব না?

অনেকে বলিয়া থাকেন যে, জলবায়ু খারাপ হইয়া এই সমস্ত ব্যতিক্রম ঘটিতেছে; ইহা প্রকৃত কি না, সে সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে বুঝিতে হইবে যে, নিজের মাথাঘোরা হইলে সেই ব্যক্তি সমস্ত রস্তুকে

ঘূর্ণ্যমান দেখে। সেই সময়ে সেই ব্যক্তি যদি নিজে না বুঝে যে, আমারই মাথা ঘুরিতেছে, তাহা হইলে ঐ ব্যক্তির পক্ষে যে বিপদ; জল বায়ুর দোষ দিয়া যাঁহারা এখন নিশ্চিন্ত হইয়া কালক্ষেপ করিতেছেন তাঁহারাও কি সেইরূপ বিপন্ন হন নাই? এই পঞ্চাশ যাট বৎসরের মধ্যে আমাদের স্বাস্থ্যসুখ দিন দিন কি জন্য তিরোহিত হইতেছে, চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ তাহা বিচার করিয়া দেখিলে নিশ্চয় বুঝিবেন যে, ব্যতিক্রম আমাদেরই হইয়াছে; প্রকৃতির ব্যতিক্রম ঘটে নাই।

যে দেশে পূর্ব্বে একটি চিকিৎসায় সুচারুরূপে চিকিৎসা-কার্য্য নির্ব্বাহ হইত, আজ সেই দেশে হাই-ড্রোপ্যাথি প্রভৃতি কত প্রকার চিকিৎসার প্রাদুর্ভাব হইতেছে, আরও যে কত হইবে, তাহাই বা কে বলিতে পারে? ব্যতিক্রমেই যে ব্যতিক্রম ঘটে, তাহা কাহারই অবিদিত নহে। পূর্ব্বকার ঋষিবাক্যে দেখা যায়, "বিবাহে চ ব্যতিক্রমঃ" এখন যুগধর্ম্মবশতঃ চিকিৎসা বিষয়েই বিশেষরূপ ব্যতিক্রম সংঘটিত হইয়াছে। কোন ব্যক্তির বহুদিনসাধ্য কোন পীড়া হইলে, কেবল যে চিকিৎসকের পরিবর্ত্তন হয়, তাহা নহে; প্রতিনিয়ত চিকিৎসারও পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। ইহা কি বিশেষ

পরিতাপের বিষয় নহে ? ইহার কারণ আত্মীয় বন্ধুদিগের মধ্যে যাঁহারা সমুপস্থিত হইয়া থাকেন, তাঁহারা পীড়ার উপর লক্ষ্য না করিয়াই যাঁহাদিগের যে চিকিৎসায় বিশ্বাস আছে, তাঁহারা সেই চিকিৎসা করাইবার জন্য অনুরোধ করিয়া থাকেন। অগত্যা রোগবিপন্নব্যক্তিগণ কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া চিকিৎসার পরিবর্ত্তন করিয়া থাকেন, এ কারণ তাঁহারা আরও বিপন্ন হইয়া পড়েন। যে হেতু নূতন নূতন পরিবর্ত্তন প্রায়ই রোগীর পক্ষে শুভ-কর হয় না। যদি প্রথমেই চিকিৎসার নির্ব্বাচন করিয়া সকলে চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হয়েন, তাহা হইলে আর পুনঃ পুনঃ চিকিৎসার পরিবর্ত্তন জন্য বিভ্রাটে পড়িতে হয় না। চিকিৎসাতত্ত্ব বিষয়ে পূর্ব্ব হইতে আলোচনা থাকিলে কোন ব্যাধি আরোগ্য হইতে দুদিন বিলম্ব হইলে কাহাকেও আর বিচলিত হইতে হয় না। কিন্তু ভ্রমের বশবর্ত্তী হইয়া পাঁচ জনের মতে যিনি পরিচালিত হইলেন, তাঁহার নিগ্রহের সীমা কোথায় ? ভ্রমবশতঃ যে কত রকম নিগ্রহ ভোগ করিতে হয়, তাহার সীমাই হয় না। রাম রহিমের উপাসনায় যিনি অগ্রসর হন, তাঁহার উপাসনা যে ভ্রান্তিমূলক, তাহাই বা কে অস্বীকার করিবে ? এবং সেই উপাসনাতে যে,

কেবল পশুশ্রমমাত্র হয়, তাহা কাহারও অবিদিত নাই।

দেহযন্ত্র যে কি ভাবে নির্ম্মিত ও কিরূপে পরিচালিত এবং দেশকাল ও বাহ্য বস্তুর সহিত তাহার কিরূপ সম্বন্ধ তাহা বিশেষরূপে জানা না থাকিলে যে, কত রকম বিপদে পড়িতে হয়, তাহার নিরূপণ হয় না। পাশ্চাত্যপ্রণালীতে এক্ষণে নানা প্রকার বিদ্যার আলোচনা হইলেও স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের যে সুচারুরূপ উপদেশ হয় না, তাহাই বা কে না জানেন? যিনি এখনকার দিনে বিজ্ঞানাদি শিক্ষা করিয়া পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ আসন প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনিও অবগত নহেন যে, মধ্যাহ্নকালে আহারান্তে নিদ্রা যাইলে কি জন্য কফপিত্ত প্রবল হইয়া থাকে। আবার দিবানিদ্রা যাহাদিগের অভ্যাস আছে, তাহারা পৌষ মাসেও দিবানিদ্রা যাইলে অপকার হয় না। আয়ুর্ব্বেদের প্রকৃত তথ্য যাঁহারা অবগত আছেন, তাঁহাদিগের পক্ষে এই সমস্ত বিষয়ের কিছুই অজ্ঞাত থাকে না। বহু প্রাচীনকা্ল প্রণীত নিম্নের শ্লোকার্থটী অবগত হইলে, জানিতে পারা যায় যে, পূর্ব্বকালে যাঁহারা আয়ুর্ব্বেদ ব্যবসায়ী ছিলেন না, তাঁহারাও আয়ুর্ব্বেদের উপদেশ গ্রহণে যত্নবান্ ছিলেন।

"আয়ুষ্কাময়মানেন ধর্ম্মার্থসুখসাধনং।
আয়ুর্ব্বেদোপদেশেষু বিধেয়ঃ পরমাদরঃ॥"

অস্যার্থঃ। ধর্ম্মার্থ সুখসাধক আয়ু যাঁহারা কামনা করিয়া থাকেন, আয়ুর্ব্বেদের উপদেশ গ্রহণে তাঁহাদিগের বিশেষরূপ যত্নবান হওয়া কর্ত্তব্য।

ইহার তাৎপর্য্যার্থ যাহা লিখিত হইল, তাহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, ধর্ম্মার্থ ও সুখের কামনা না করে, এরূপ লোকই অপ্রসিদ্ধ। ইহাতেই প্রতিপন্ন হয় যে, আয়ুর্ব্বেদের অর্থ গ্রহণে পূর্ব্বে সকলেই যত্নবান্ ছিলেন। এবং এই সম্বন্ধে আরও বহুতর প্রমাণ প্রদর্শন করা যাইতে পারে; কিন্তু বাহুল্যপ্রযুক্ত উল্লেখ করা হইল না। আয়ুর্ব্বেদের অভিজ্ঞতা নিবন্ধন পূর্ব্বকার ব্যক্তিগণ এখনকার মত চিকিৎসায় প্রবঞ্চিত হইতেন না। তাঁহারা চিকিৎসকদিগের গুণাগুণ বিচার করিয়া সুচিকিৎসক দ্বারায় চিকিৎসা করাইতেন। সুতরাং দেশীয় চিকিৎসার উপরে নির্ভর করিয়া সুস্থ শরীরে দীর্ঘজীবন লাভ করিতেন। ঋষিপ্রণীত শাস্ত্রার্থ নির্ণয় করিয়া চিকিৎসা করা বড়ই দুরূহ ব্যাপার। গুরূপদেশে অনুরক্ত না হইলে প্রকৃত তাৎপর্য্য কাহারই হৃদয়ঙ্গম হয় না। ইহা অন্যান্য ব্যবসায়ের মত অর্থকরী বিদ্যা নহে। আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রকারগণ

বৈদ্যকে আচার্য্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সেই আচার্য্য যদি অনাচার করেন (শাস্ত্রোপদেশ গ্রহণ না করিয়া অর্থোপার্জ্জনের নিমিত্ত চিকিৎসা করেন) তাহা হইলে দেশীয় চিকিৎসার উপর সকল ব্যক্তির যে অনাস্থা হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? দেশীয় চিকিৎসায় অবিশ্বাস হইলে অগত্যা অন্য চিকিৎসা করাইতে হয়। আবার তাহাতে যদি নানাবিধ বিঘ্ন ঘটে, তবে চিকিৎসান্তর ভিন্ন গত্যন্তর কি? এই রূপে নানা প্রকার চিকিৎসার প্রচার হইতেছে কি না; চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ তাহা আলোচনা করিয়া দেখিবেন কি?

"দেবে তীর্থে দ্বিজে মন্ত্রে দৈবজ্ঞে ভেষজে গুরৌ।
যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী॥"

অর্থ। দেবতা, তীর্থ, ব্রাহ্মণ, মন্ত্র, ঔষধি, ও গুরুতে যাঁহার যেরূপ ভাবনা, তাঁহার সিদ্ধিও তদনুরূপ হয়।

এই মহাবাক্যমতে যাঁহারা কার্য্য করিয়া থাকেন, তাঁহারা অগ্রে চিকিৎসা ও চিকিৎসকের নির্ব্বাচন না করিয়া চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হন না। বলা বাহুল্য যে,এরূপ ভাবে যাঁহারা চিকিৎসা করাইয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে আর বর্ত্তমান লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয় না। কিন্তু সামাজিক অবস্থা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত হইয়া উঠি-

য়াছে। ৩।৪ রকম চিকিৎসা ও ৮।১০ জন চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসা না হইলে অনেকের মন উঠে না। ঐ রূপ চিকিৎসা-বিভ্রাটে পড়িয়া যদি অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, তাহা হইলে অনেকেই মনকে প্রবোধ দিয়া থাকেন যে, চিকিৎসার কোন রূপ ক্রটী হইতেছে না। কিন্তু এরূপ স্থলে চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা করিলে বুঝিতে পারিবেন যে, চিকিৎসার ক্রটী ব্যতীত কখন সেরূপ সংঘটিত হয় না। আর বলা বাহুল্য যে, দেশীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের উপরে নির্ভর না থাকায় এই সমস্ত বিভ্রাটে পড়িতে হয়।

মনে করিয়া দেখুন, কোন ব্যক্তি পিত্তদোষবশতঃ শ্বেতবস্ত্রকে পীতবর্ণ দেখে, সে দোষ কিছু বস্ত্রের নহে; পিত্ত-দোষই তাহার প্রকৃত কারণ। কিন্তু ঐ বস্ত্রকে পূর্ব্বে যদি শ্বেত বর্ণ বলিয়া ধারণা থাকে তাহা হইলে প্রকৃত দোষের নির্ণয় হইতে পারে। আর ঐ বস্ত্র সম্বন্ধে যাহার কোন জ্ঞানই পূর্ব্বে হয় নাই, সে ব্যক্তি, কিরূপে বুঝিবে যে, বস্ত্রখানি পীত বর্ণ নহে। সেইরূপ যাঁহারা প্রত্যক্ষ করিলেন যে, আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধে যে ব্যক্তি আরোগ্য হইল না, বিদেশীয় চিকিৎসায় সে ব্যক্তি নীরোগ হইল; অনন্তর তাঁহাদের বিশ্বাস হইল

যে, বিদেশীয় ঔষধেই বিশেষ ফল পাওয়া যায়। পরে যদি ঐ পীড়াটী পুনরায় হয়, তাহা হইলে বিদেশীয় ঔষধের উপরে আশু-ফলদায়ক বলিয়া বিশ্বাস হইয়া পড়ে। আবার যদি ঐ পীড়াটী আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধে আরোগ্য হয়, তাহা হইলে আয়ুর্ব্বেদ-বিহিত চিকিৎসা দ্বারা পুরাতন ব্যাধি আরোগ্য হয়, এই বিশ্বাসটী জন্মিয়া যায়; কিন্তু এবারেও যদি আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধে ফল না পাওয়া যায়, তাহা হইলে ম্যালেরিয়া বা দৈশিক দোষ ইত্যাদি সিদ্ধান্ত হইয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃত কারণ কি, তাহা সাধারণের বুঝিবার উপায় নাই। সেই জন্য বলিতেছি যে, আয়ুর্ব্বেদের সমালোচনার বিশেষ প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে। যদি পূর্ব্ব হইতে রীতিমত আয়ুর্ব্বেদের সমালোচনা করা থাকে, তাহা হইলে সেই রোগী হইতেই প্রকৃত রহস্য নির্ণয় হইতে পারে। এবং তাহা হইলে আর বিদেশীয় চিকিৎসার লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয় না। সাধ্য পীড়া, অথচ আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধে উপকার হইল না; ইহার প্রধান কারণ অকৃত্রিম ঔষধের অভাব। অকৃত্রিম ঔষধ উপযুক্ত ভাবে প্রয়োগ করিলে যে কি অচিন্তনীয় ফল লাভ করা যায়, যাঁহারা সেই ফল প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহারাই তাহা বুঝিয়া-

ছেন। পূর্ব্বকার হিন্দুরা অতিশয় ধর্ম্মভীরু ছিলেন; সুতরাং তাঁহারা যে সকল ঔষধ প্রস্তুত করিতেন, তাহা অকৃত্রিম হইত। এই হেতু ম্যালেরিয়া প্রভৃতি ভীষণ রোগ সেই সময়ের লোকদিগকে প্রত্যক্ষ করিতে হইত না। অল্পকাল পূর্ব্বে আমাদের দেশীয় ধনীব্যক্তিগণ বাটীতে বৈদ্য রাখিয়া ভাল ঔষধ ও তৈল প্রস্তুত করাইয়া নিজ পরিবারবর্গের ও অন্যান্য লোকের কঠিন কঠিন পীড়া আরোগ্য করিয়া, ধর্ম্ম, যশ ও স্বচ্ছন্দতা লাভ করিতেন। ইহাতে অকৃত্রিম ঔষধের অভাব বড় বেশী হইত না। প্রকৃতপক্ষে যত প্রকার দান আছে, তাহার মধ্যে আরোগ্য-দানই যে শ্রেষ্ঠ, তাহা বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন। কিন্তু এক্ষণে প্রায় কোন ধনী ব্যক্তি-কেই দেশীয় চিকিৎসাদ্বারা স্বদেশবাসীদিগের উপকার করিতে দেখা যায় না।

অদ্য যে বিষয়ের অবতারণা করা গিয়াছে, ইহা অতিশয় দুরূহ; সুতরাং এ সম্বন্ধে কোন কথা বলিয়া উঠা বড় কঠিন ব্যাপার। তবে মাদৃশ ক্ষুদ্র ব্যক্তি কি জন্য ইহাতে হস্তক্ষেপ করিয়াছে? কেহ যেন মনে না করেন যে, আমি আয়ুর্ব্বেদ-ব্যবসায়ী বলিয়া অগ্রসর হইয়াছি। উপজীবিকা নির্ব্বাহের নিমিত্ত আরও

অনেক প্রকার ব্যবসায় আছে; অধিকন্তু ঐ সমস্ত ব্যবসায়ের অবলম্বন করিয়া অনেক বড় বড় ধনী হইয়াছেন। দেশীয় চিকিৎসা করিয়া ধনী হইতে প্রায় দেখা যায় না। ইহা বোধ হয় সকলেই জানেন যে, আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ চিরদিনই এই ব্যবসায় করিয়া প্রায় কখন কেহ ধনী হইতে পারেন নাই। আজ সেই ব্যবসায়ের মূলোচ্ছেদ দেখিয়া কেনই বা দুঃখিত হইব? যে আকুলতায় ইহাতে আমরা অগ্রসর হইয়াছি, তাহা সহৃদয় পাঠকগণ ক্রমে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন এবং এ ভরসাও সম্পূর্ণ করি যে, তাঁহারা অবগত হইয়া অনুকূলতা দেখাইয়া সহৃদয়তার পরিচয় দিবেন।

বিজ্ঞবর পাঠকদিগকে আর একটী কথা বলিব। সময় নির্ণয় করিবার যন্ত্র ঘড়াটী যদি ভাঙ্গিয়া যায়, তাহা হইলে যে কারিকর ঐ ঘড়ীটী নির্ম্মাণ করিয়াছে, সেই কারিকর অথবা তাহার নিকট যে ব্যক্তি উপদেশ পাইয়াছে, সেই ব্যক্তিই দস্তুরমত মেরামৎ করিতে পারিবে। উহারা ভিন্ন ঐ ঘড়ী যে ব্যক্তি মেরামৎ করিতে যাইবে, তাহার দ্বারা আরও খারাপ ব্যতীত পূর্ব্বকার মত হইবে না। আর এই অদ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ কারিকর কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত শরীরটী দূষিত হইলে যে কোন

ব্যক্তি আসিয়া মেরামৎ করিয়া দিবে এইরূপ আশা, আর মরুভূমিতে যাইয়া পঙ্কলেপনপূর্ব্বক শীতল হইবার প্রত্যাশা করা চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের নিকট তুল্য বলিয়াই বোধ হইবে।

আর একটী বড়ই বিস্ময়কর কথা যে, অর্থসুলভ ঘড়ীটীর কল বিগ্‌ড়াইলে যে কোন ব্যক্তি দ্বারা মেরামৎ করাইতে কাহাকেও কখন অগ্রসর হইতে দেখি না। আর ঐ সমস্ত ব্যক্তির শরীর খারাপ হইলে আগন্তুক আসিয়া যদি বলিল যে, এই ঔষধ সেবন কর, এখনি আরোগ্য হইবে। এই আরোগ্যের ফলভোগ অনেকে করিয়াছেন ও করিতেছেন এবং ভবিষ্যতেও সহ্য করিবার জন্য প্রস্তুত আছেন। পুণ্যভূমি আর্য্যাবর্ত্তবাসীর সন্তানদিগের এইরূপ আচরণ দেখিলে কাহার না হৃদয় ফাটিয়া উঠে! যাঁহারা দর্শন-শাস্ত্রের বিচারে অদ্যাপি পৃথিবীতে অজেয় রহিয়াছেন; তাঁহাদিগের সেই বিচার শক্তির এরূপ বিলয় দেখি কেন? এবং লোকাতীত শক্তিসম্পন্ন ঋষিদিগের প্রণীত শাস্ত্রের নির্ম্মাণকৌশল দেখিলে কোন্ হৃদয়ে যুগপৎ বিস্ময় ও ভক্তির আবির্ভাব না হয়? সেই ঋষিপ্রণীত সংহিতা বিদ্যমান থাকিতে, কেন আমরা এক্ষণে পরমুখাপেক্ষী

হইলাম? পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, অশিক্ষিত ব্যক্তি দ্বারা অযোগ্য বা কৃত্রিম ঔষধের ব্যবহারই সকল অনর্থের কারণ। দেশীয় ঔষধে অভিলষিত ফল প্রাপ্ত না হইলে, লোকের মনে নানা প্রকার সংশয় উপস্থিত হইয়া পড়ে। কেহ কেহ বলেন যে, পূর্ব্বকার লোকদিগের দেশীয় ঔষধে উপকার হইত, এখন দেশকাল পরিবর্ত্তিত হওয়ায় তাদৃশ উপকার হয় না। আবার কেহ বা ইহাও বলিয়া থাকেন যে, পূর্ব্বকার ব্যাধি ও এখনকার ব্যাধির লক্ষণ স্বতন্ত্র হওয়ায় দেশীয় ঔষধে সেরূপ ফল পাওয়া যায় না। এইরূপ অনেকে অনেক রকম বলিয়া থাকেন, কিন্তু যে কারণে এই সমস্ত প্রবাদের সৃষ্টি হইতেছে, তাহা কেহই ভাবিয়া দেখেন না। অধিকন্তু প্রায় সকলেই নানা কল্পিত কারণের অবতারণা করিয়া সাব্যস্ত করিবার নিমিত্ত বিশেষ যত্ন পাইয়া থাকেন। এইজন্য বলি যে, আয়ু-র্ব্বেদের প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণ করা বিশেষ আবশ্যক হইয়াছে। যে দ্রব্যের জন্য তুমি ব্যগ্র হইয়াছ, সেই দ্রব্যের উপাদান যদি তোমারই ঘরে থাকে, তবে আর ব্যস্ত হইয়া ভিখারীর বেশে কি জন্য পরিভ্রমণ কর? তাই বলি যে, ঘর অনুসন্ধান বা আয়ুর্ব্বেদের সমালোচনা করা সর্ব্বপ্রথমে কর্ত্তব্য। পূর্ব্বকার মতগুলি বিচার

করিয়া যদিও প্রকৃত কারণ নির্ণয় করিতে পারা যায়, কিন্তু তাহা সদ্যুক্তি বোধ করি না। যেহেতু বিচার্য্য বিষয়ে অনুকূল যুক্তি অনেকেই দেখাইতে পারেন। আর এইরূপ বিচারে কাহারও কোন ফললাভ হয় না, বেশীর ভাগ সেই সমস্ত বিচার্য্য বিষয় প্রায় সাধারণের বোধগম্য হয় না। এই হেতু বিনা বিচারে বলিতে ইচ্ছা হয় যে, অগ্রে আয়ুর্ব্বেদের সমালোচনা কর। যে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা দ্বারা বহু পূর্ব্বকাল হইতে অস্মদীয় পূর্ব্বপুরুষ-দিগের শরীর রক্ষা হইয়া আসিয়াছে, এখন সেই আয়ুর্ব্বেদদ্বারা দেশের প্রকৃত কল্যাণ কেন সাধিত হইবে না ?

বর্ত্তমান চিকিৎসা-বিপত্তির অন্যান্য কারণগুলি বিস্তারপূর্ব্বক বলিতে হইলে প্রবন্ধটী অতি বৃহৎ হইয়া পড়ে ; এজন্য ইহা এইখানেই শেষ করা হইল। পরি-ণামদর্শী ব্যক্তিগণ এইরূপ আলোচনায় প্রীত হইয়া, যদি আমাদিগকে উৎসাহ প্রদান করেন, তাহা হইলে শাস্ত্রীয় যুক্তি প্রমাণাদি দ্বারা সমধিক উৎসাহে, সহৃদয় পাঠক মহোদয়গণের নিকট পুনর্ব্বার সমুপস্থিত হইব। যে দেশে বহু রোগের প্রাদুর্ভাব হয়, শিল্প বাণিজ্যাদি দ্বারা সে দেশে কোনরূপ সুফল হয় না। শরীর যখন

ভাল থাকে, সে সময়ে নানা প্রকার অত্যাচার সহ্য হয় কিন্তু শরীর খারাপ হইলে কিছুই সহ্য হয় না। বলা বাহুল্য যে, পাথরে চাপড় মারিলেও যে হাতে বেদনা বোধ হয় না, আবার সেই হাতে ক্ষত হইলে তুলার সংঘর্ষণেও কষ্ট বোধ হয়। এ জন্য যে কোন পীড়াগ্রস্ত ব্যক্তিকে আমরা সর্ব্বদা বলিয়া থাকি যে, এখন তুমি বিশেষরূপ সাবধান হও। সহজ শরীরে যে সমস্ত অত্যাচার করিয়াছ, সেইরূপ অত্যাচার এখন আর হইবে না। পীড়িতাবস্থায় হিতকর ঔষধ বলিয়া যাহা ব্যবহৃত হয়, তাহা যদি শরীর ও পীড়ার উপযোগী না হয়, তাহাতে বিশেষরূপ অনিষ্ট হইয়া থাকে। একারণ চিকিৎসা বিষয়ে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য পূর্ব্বে স্থির করা পরিণামদর্শীদিগের একান্ত কর্ত্তব্য। আমরা সেইটী বুঝাইবার জন্য এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছি কিন্তু—

"ফলং পুনস্তদেব স্যাদ্ যদ্বিধের্মনসি স্থিতং।"

ভবৌষধ।

সাধনার পথ।

তন্ত্রশাস্ত্রে, মহাপুরাণে এবং উপনিষদাদি ব্রহ্মবাক্যে সাধনার ভিন্ন ভিন্ন পথ প্রদর্শিত হইয়াছে। ঐ সমস্ত শাস্ত্রবাক্যের উদ্দেশ্য এক হইলেও, মর্ম্ম বুঝিয়া তত্ত্ব নির্ণয় করা বড়ই কঠিন। কবিরঞ্জন মহাত্মা রামপ্রসাদ সেন ইহা বুঝিয়া চিত্ত-বিনোদন গীত দ্বারা সাধনার পথ দেখাইয়া গিয়াছেন ঃ—

"প্রসাদ বলে, সোজা পথ পেলে পরে, বাঁকায় কে যায়?
ধরেছ যা ধ'রে থাক, ছেড়ো না, প্রাণ থাকে কি যায়॥"

এরূপ সরল ভাষায় যুক্তিপূর্ণ বাক্য, কাহারও দ্বারায় প্রকাশিত হয় নাই। বহু সাধক সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, কিন্তু রামপ্রসাদ অন্যকে সাধনার পথ দেখা-ইবার জন্য যেরূপ যত্ন করিয়া গিয়াছেন এরূপ আর কাহাকেও দেখিতে পাওয়া যায় না।

কর্ম্মি-জীব নিয়ত কর্ম্ম করিয়া, কর্ম্মফল লাভ করিয়াও

তৃপ্তি লাভ করিতে পারে না। ইহাতে কি বোধ হয় না যে, সে যাহা লাভ করিবার জন্য ব্যগ্র, তাহা সে লাভ করিতে সক্ষম হইতেছে না। এখানে বলিয়া রাখা ভাল যে, সে যাহাতে পরিতুষ্ট হইবে সে তাহা পাইতেছে না। এবং তাহা যে কি, সে তাহা নিজেও বুঝে না।

যত কিছু গোল এইখানে। এই গোল মিটাইবার জন্য শাস্ত্রকার মহর্ষিগণ আধ্যাত্মিক বিষয়ের মর্ম্ম নানা প্রকার যুক্তি দ্বারা জীব যাহা চাহে তাহা নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু কালদোষে শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস না থাকায় এবং দুরূহ আর্য্যবাক্যের মর্ম্ম বুঝিতে না পারায়, প্রকৃত পথের পথিক অনেকে হইতে পারেন না। ইহ-লোক, পরলোক ও পরমশান্তিপ্রদ মুক্তি বহু যুক্তি দ্বারা মহর্ষিরা নির্ণয় করিয়াছেন। কবিরঞ্জন মহাত্মা রামপ্রসাদ সেন সেই সমস্ত শাস্ত্র মন্থন করিয়া সহজভাষায় তত্ত্ব নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন।

"ইহজন্ম পরজন্ম বহুজন্ম পরে,
রামপ্রসাদ বলে আর জন্ম হবে না জঠরে।"

প্রসাদের বাক্য ঋষিবাক্যের ন্যায় যে অভ্রান্ত, সে বিষয়ে আর সংশয় কি? এবং সে বাক্য দ্বারা যাহা নির্ণীত হইবে, তাহাতে অবিশ্বাসের কোন কারণ নাই।

এই হেতু আমরা গীত দ্বারা নির্দ্দিষ্ট পথ জনসমাজে প্রকাশ করিলাম।

"মন রে ভালবাস তাঁরে।
যে জন ভবসিন্ধু পারে তারে॥
এই কর ধার্য্য, কিবা কার্য্য, অসার পসারে।
ধনে জনে আশা বৃথা, বিস্মৃত সে পূর্ব্বকথা,
তুমি ছিলে কোথা, এলে কোথা, যাবে কোথা কারে?
সংসার কেবল কাচ, কুহকে নাচায় নাচ,
মায়াবিনী-কোলে আছ, প'ড়ে কারাগারে॥
অহঙ্কার, দ্বেষ, রাগ, অনুকূলে অনুরাগ,
দেহ-রাজ্যে, দিলে ভাগ, বল কোন বিচারে?
যা ক'রেছ চারা কিবা, প্রায় অবসান দিবা,
মণি-দ্বীপে ভাব শিবা, সদা শিবাগা:
প্রসাদ বলে দুর্গানাম, সুধাময় মোক্ষধাম,
জপ কর অবিশ্রাম, সুধাও রসনারে॥"

পাঠক! ইহার কি ব্যাখ্যা করিতে হইবে? ভব-সিন্ধুর বিন্দুবৎ ধন ও জন, ইহা এই আছে এই নাই; সুতরাং তাহার উপর ভালবাসা কেবল যন্ত্রণা-ভোগের কারণ। কিন্তু নিত্যবস্তুকে ভালবাসিলে সেরূপ চিন্তা থাকে না। পাঠক! আরও কি দেখিয়াছ? কারাগারে (জেলখানায়) প্রহরীদিগের চাবুকের ভয়ে, কয়েদীরা খাটিয়া থাকে; কিন্তু সেখানে রাত্রে খাটিতে হয় না।

আর আমরা সংসার-কারাগৃহে দিবারাত্রি খাটিয়াও নিস্তার পাই না। আবার অশান্তিপ্রদ দ্বেষ, রাগ ও কাম প্রভৃতি যেগুলি বিনা আহ্বানে আসিয়া দেহের উপর সন্তাপ-রূপ চাবুক দ্বারা আধিপত্য বিস্তার করে, তাহাদের উপর আমাদের কতই অনুরাগ! ইহা কি আর বুঝাইয়া দিতে হইবে? সামান্য এক ছটাক জমী কেহ দখল করিলে, প্রাণপণ করিয়া বাধা দিয়া থাকি, কিন্তু যে দেহ লইয়া জমির উপরে আধিপত্য, আমরা সেই দেহ-রাজ্যে কোন ওজর আপত্য না করিয়া দুর্দ্দমনীয় শত্রুদিগকে দখল দিয়া থাকি! ইহার উপর নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় আর কি আছে? "মণি-দ্বীপে ভাব শিবা" ইত্যাদি সাধনার কথা, ইহার ব্যাখ্যা করা হইল না। কারণ মহাত্মা কবিরঞ্জনের গীতান্তরে আদেশ আছে,—

"চাতরে কি ভাঙ্গ্বো হাঁড়ি, বুঝে নে মন! ঠারে ঠোরে।"

চাতরে বা চত্বরে অর্থাৎ উঠানে হাঁড়ি ভাঙ্গিলে সে হাঁড়ির অন্ন অব্যবহার্য্য হয়, কিন্তু রন্ধনশালায় অর্থাৎ নিভৃতে হাঁড়ি ভাঙ্গিলে ক্ষতি হয় না।

কোন এক মুক্তিকামী ব্রাহ্মণ স্ত্রী, পুত্র ও কন্যা লইয়া উঞ্ছবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন।* কৃষক

* ক্ষেত্রস্বামী ক্ষেত্র কোন স্থানে শস্য একত্রিত করিয়া পরে গৃহে লইয়া যান। ক্ষেত্রস্বামী লইয়া যাইবার পর সেই পরিত্যক্ত শস্য সংগ্রাহকের বৃত্তিকে উঞ্ছবৃত্তি বলে।

পক্ষের পঞ্চদশ দিবস কাল ব্রতাদি দৈবকার্য্য ও শ্রাদ্ধাদি পৈত্র্যকার্য্য করিতেন। শুক্লপক্ষে দৈবকার্য্য ও উঞ্ছবৃত্তি দ্বারা ধান্য সঞ্চয় করিতেন। ধান্য এরূপ পরিমাণে সঞ্চয় করিতেন যে, কৃষ্ণপক্ষে ধান্য সঞ্চয় না করিলেও চলিয়া যাইত। কৃষ্ণপক্ষে দৈব ও পৈত্র্য উভয়বিধ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় উঞ্ছবৃত্তি দ্বারা ধান্য সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইলেও শুক্লপক্ষ সঞ্চিত শস্য থাকায় ব্রাহ্মণকে অতিথি, অভ্যাগত বিমুখ করিতে হইত না। এই প্রকারে বহুকাল গত হইলে মহর্ষি দুর্ব্বাসা উক্ত ব্রাহ্মণের এক-নিষ্ঠতার পরীক্ষার জন্য উন্মাদবেশে খাদ্যকালে উপস্থিত হইয়া জানাইতেন যে, আমি বড়ই ক্ষুধার্ত্ত। ব্রাহ্মণ তাঁহাকে সাগ্রহে শাকান্নাদি প্রদান করিতেন। মহর্ষি অন্ন পাইয়াই বলিতেন, ইহাতে আমার ক্ষুন্নিবৃত্তি হইবে না। পুনঃ পুনঃ এই কথা বলিয়া বারংবার অন্ন গ্রহণ করিয়া, একজনের খাদ্যোপযোগী অন্নাদি ভোজন করিয়া, অবশিষ্ট অন্নগুলি গাত্রে মাখিয়া চলিয়া যাইতেন। মহর্ষির এই অসদ্ব্যবহারে ব্রাহ্মণের অন্ন অকুলান হইত, এবং সকলকার ক্ষুন্নিবৃত্তি হইত না। প্রতি কৃষ্ণপক্ষে এইরূপে ছয় বার অতিথি হওয়ার পরে, সপ্তম বারে আসিয়া দেখিলেন, পূর্ব্ব ছয় বারে যেরূপ আদর আপ্যায়ন

পাইয়াছিলেন, এবারেও সেইরূপ যত্ন পাইয়া প্রীতি-প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, "দ্বিজবর! আমি অন্ন ভোজনের জন্য আসি নাই। তোমার গার্হস্থ্য-ব্রতের একনিষ্ঠতা দেখিবার জন্য বারংবার আসিয়াছিলাম। প্রতিবারেই তোমার ব্যবহারে আমি পরিতুষ্ট হইয়াছি। প্রথমবার যেরূপ আদর পাইয়াছিলাম, পুনঃ পুনঃ আসিয়াও তাহার কোন ব্যতিক্রম দেখি নাই। সম্প্রতি আমি দেবলোক হইতে আসিতেছি। সেখানে তোমার জন্য ব্যবস্থা করিয়াছি যে যতগুলি তোমার প্রীতিপাত্র আছে, তাহা-দিগকে লইয়া এখনি যে দেববিমান আসিবে, তাহাতে আরোহণ করিয়া দেবভবনে (স্বর্গে) গমন করিবে। আমি দুর্ব্বাসা ঋষি।" ইহা বলিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন।

অনতিবিলম্বে স্বর্গ হইতে দেবদূত দেবযান লইয়া সেই পুণ্যশ্লোক ব্রাহ্মণের নিকট সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, "মহাত্মন্! আমি দেবলোক হইতে আসিতেছি; আপনার প্রিয়জনবর্গকে সঙ্গে লইয়া, এই দেবযানে আরোহণ করিয়া, আমার সহ দেবলোকে গমন করুন।" ব্রাহ্মণ ত আর আমাদের মত নহেন যে, একটা নূতন যান পাইয়া নূতন প্রদেশ দেখিবার জন্য সমুৎসুক হইবেন!

প্রত্যুত্তরে তিনি কহিলেন, "আমি যে স্থানে বাস করিতেছি, ইহা ত দেবধাম হইতে নিকৃষ্ট নহে যে, ইহা পরিত্যাগ করিয়া সেই লোকে যাইব?"

ভোগ-নিরত দেবদূত এই কথা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, "দেবধাম ও মর্ত্ত্যলোক তুলনা হয় না। মর্ত্ত্যধামে যত প্রকার সুখ আছে তাহার পরিণাম অশান্তিময়, আর দেবলোকে যে সুখ, তাহার আদি অন্তে অশান্তি ভোগ করিতে হয় না। আর মর্ত্ত্যধামের মত তথায় শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা নাই। সেখানে চিরবসন্তের প্রাদুর্ভাব। এবং আধিভৌতিক তাপাদিও ভোগ করিতে হয় না।"

প্রত্যুত্তরে ব্রাহ্মণ কহিলেন, "দূতবর! সেখানে এই প্রকার সুখভোগ কত কাল করিতে পাইব? দেবদূত ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক কহিলেন "বিপ্রোত্তম! আপনার পুণ্যবল এত অধিক যে, আপনি অনন্তকাল স্বর্গে অবস্থান করিয়া স্বজনবর্গের সহিত দেবগণের ন্যায় অমরত্ব লাভ করিবেন।" ব্রাহ্মণ কহিলেন "সুরবর! আমরা জানিতাম যে মর্ত্ত্যবাসী জনগণ স্বার্থানুরোধে সত্য হইতে বিচ্যুত হয়, কিন্তু ভবাদৃশ মহাত্মারা বহুপুণ্য ফলে দেবলোকে বাস করিয়াও অকারণ আমাকে বঞ্চনা

করিতেছেন কেন ?” দেবদূত সোৎসাহে বলিলেন, “দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! আপনাকে কেন স্বার্থের অনুরোধে বঞ্চনা করিতে প্রবৃত্ত হইব ? আমি ত আর মর্ত্ত্যলোকে বাস করিবার জন্য আসি নাই। আপনাদের দেবযানারোহণ করিতে যেটুকু সময় অতিবাহিত হইবে, সেইটুকু সময় আমার এখানে অবস্থিতি। ভবাদৃশ পরিণামদর্শী কেন যে আমাকে বঞ্চক বলিয়া স্থির করিলেন, তাহা আমি বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না।” ব্রাহ্মণ কহিলেন “দূতবর ! যে স্থানে আপনারা বাস করেন, সেই স্বর্গ-ধামের স্থিতিরও একটা নির্দ্দিষ্ট কাল আছে। আর আমরা সেই স্থানে যাইয়া অনন্তকাল সুখভোগ করিব ? এ বাক্যকে বঞ্চনার রূপান্তর ভিন্ন আর কি মনে করিব ? আমি কি ভূবলোকাদির বিষয় অবগত নহি যে, ঐ সমস্ত লোক মহাপ্রলয়ে লয় হইয়া যাইবে ? অতএব আপনি যে বলিলেন ‘তুমি অনন্তকাল দেবলোকে বাস করিবে’ ইহা কি প্রকারে বিশ্বাস করিতে পারি ?”

অনন্তর দেবদূত কহিলেন, “মহাত্মন্ ! আমি আপ-নাকে বঞ্চনা করিবার অভিপ্রায়ে কোন কথা বলি নাই। এবং বঞ্চনা করিবার কোন কারণও উপস্থিত হয় নাই। দেবতাদিগকে লোকে অমর বলে, ইহাতে কি বুঝিতে

হইবে যে, তাঁহাদের আর ক্ষয় নাই? তাঁহারা অমর হইলেও কালে তাঁহাদেরও লয় হইবে। সেইরূপ তাঁহাদের আবাসস্থান স্বর্গেরও লয় হইবে। ইহা কি ভবাদৃশ অধ্যাত্মবিৎ মহাপুরুষকে বুঝাইয়া দিতে হইবে? আপনার পুণ্যবল এত অধিক যে, যাবৎ স্বর্গ-লোক তাবৎ কাল আপনি স্বর্গবাস করিতে পারিবেন।"

ব্রাহ্মণ ঈষৎ হাস্য পূর্ব্বক বলিলেন, "দূতশ্রেষ্ঠ! এই যে সমস্ত বৃত্তান্ত আমার নিকটে বর্ণনা করিলেন, তাহাতে আমার প্রতীতি হয় যে, সেই দেবলোকে দুঃখ-শূন্য নিরবচ্ছিন্ন স্বর্গভোগে বহু সহস্র বৎসর আমার পক্ষে ক্ষণকালের ন্যায় অতিবাহিত হইবে। আবার ত আমাকে এই কর্ম্মভূমিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া দুঃখে রোদন ও সুখে উল্লাস প্রকাশ পূর্ব্বক কালক্ষেপ করিতে হইবে? আমার আর সে বাসনা নাই। বহুজন্ম গত হইয়াছে, আর ভোগায়তন দেবলোকে এবং কর্ম্মভূমি মর্ত্ত্যধামে ভ্রমণ করিবার কামনা নাই। এখন আমি মুক্তি কামনায় দিন যাপন করিতেছি। ইহার পর অহেতুকী ভক্তি লাভ করিয়া সেই পরমপদ মোক্ষ লাভের জন্য চেষ্টা করিতেছি। এই জন্মে বা পর-জন্মে তাহা লাভ হইলে সিদ্ধমনোরথ হইব।" অনন্তর

দেবদূত ব্রাহ্মণের এইরূপ দৃঢ়তা দেখিয়া স্বধামে প্রতিগমন করিলেন।

মোক্ষলিপ্সু ব্রাহ্মণ যে মুক্তিলাভের জন্য দৃঢ়তা সহকারে উদ্যম করিতেছিলেন, সেই মুক্তির সম্বন্ধে মহাত্মা কবিরঞ্জন বলিয়াছেন ঃ—

"আর কাজ কি আমার কাশী?
মায়ের পদতলে প'ড়ে আছে, গয়া গঙ্গা বারাণসী॥
হৃদ্‌কমলে ধ্যানকালে, আনন্দ-সাগরে ভাসি।
ওরে কালীর পদ কোকনদ, তীর্থ রাশি রাশি॥
কালী নামে পাপ কোথা, মাথা নাই তার মাথা ব্যথা,
(ওরে) অনলে দহন যথা, হয় রে তুলারাশি।
গয়ায় ক'বে পিণ্ডদান, বলে পিতৃ-ঋণে পাবে ত্রাণ,
(ওরে) যে করে কালীর ধ্যান, তার গয়া শুনে হাসি॥
কাশীতে মরিলে মুক্তি, এই বটে শিবের উক্তি,
(ওরে) সকলের মূল ভক্তি, মুক্তি হয় তার দাসী॥
নির্ব্বাণে কি আছে ফল, জলেতে মিশায় জল,
(ওরে) চিনি হওয়া ভাল নয় মন! চিনি খেতে ভালবাসি॥
কৌতুকে প্রসাদ বলে, করুণানিধির বলে,
(ওরে) চতুর্ব্বর্গ করতলে, ভাবিলে সেই এলোকেশী॥"

ভবৌষধ।

সাধন সঙ্গীত।

রাগিণী পিলু বাহার—তাল যৎ।

(শোন রে) মন তোরে বলি, ভজ কালী,
ইচ্ছা হয় যেই আচারে।
মুখে গুরুদত্ত মন্ত্র পড়, দিবা নিশি কর ধ'রে॥
শয়নে প্রণাম জ্ঞান, নিদ্রায় কর মাকে ধ্যান।
ওরে নগর ফির, মনে কর, প্রদক্ষিণ করি শ্যামা মারে॥
যত শোন কর্ণপুটে, সকলি মায়ের মন্ত্র বটে,
কালী পঞ্চাশৎবর্ণময়ী, বর্ণে বর্ণে নাম শোন রে॥
কৌতুকে রামপ্রসাদ রটে, ব্রহ্মময়ী সর্ব্ব ঘটে।
ওরে আহার কর, মনে কর, আহুতি দেই শ্যামা মাকে॥*

* ভক্ত পাঠক! সাধনার এই পথটি কি তোমার অবলম্বনায় হইবে? তাহা হইলে সাধনার জন্য আর যে তোমার কোন চিন্তা থাকিবে না! "যার ঘুম তারে দিয়ে, ঘুমেরে ঘুমপাড়াইবে।"

সিন্ধু খাম্বাজ—তাল মধ্যমান।

আমরা হই গো মায়ের ছেলে, বাবার কোন ধার ধারি না।
বন্ধ্যা জনের হ'লে ছেলে, সে ছেলে কারে মানে না ॥
প্রলয়েতে বন্ধ্যা মাতা, পরেতে হয় সত্য ত্রেতা।
বুঝিয়ে সে মায়ের কথা, মা বই কিছু বলি না ॥
দ্বন্দ হ'লে মাতা পিতায়, ছেলে তখন মাতাকে চায়।
তাই মন সঁপেছি মাতায়, মা বই কিছু জানি না ॥
বাবা প'ড়ে মায়ের পায়, মা ছেড়ে কে বাবা পায়।
মর্ম্ম বুঝে তত্ত্বকথায়, কালিদাস তাই মা ছাড়ে না ॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

কে জানে গো কালী কেমন ?
ষড়্দর্শনে না পায় দরশন ॥

কালী পদ্মবনে, হংস সনে, হংসীরূপে করে রমণ।
তাঁকে সহস্রারে মূলাধারে, সদা যোগী করে মনন ॥
আত্মারামের আত্মা কালী, প্রণাম প্রণবের মতন।
তিনি ঘটে ঘটে বিরাজ করেন, ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন ॥
মায়ের উদর ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড, প্রকাণ্ড তা জান কেমন।
মহাকাল জেনেছেন কালীর মর্ম্ম, অন্যে কেবা জানে তেমন

প্রসাদ ভাষে, লোকে হাসে, সন্তরণে সিন্ধু গমন।
আমার প্রাণ বুঝেছে,মন বোঝে না,ধর্‌বে শশী হ'য়ে বামন ॥*

বেহাগ—তাল আড়াঠেকা।

বিষয় বৈভব সুখে সদা মন যায়।
তাতে কেন অপরাধী, কর মা! তুমি আমায়?
তোমারি ত বিরচিত, মোহ আদি পঞ্চ ভূত,
মন যে তাহার অনুগত, তোমারি মায়ায়।
তিলেক আমার মন, তোমা ছাড়া নয় কখন,
তবে কেন অকারণ, দোষী আমি তব পায়?
আমার কি দোষ তারা, আমি ত নই সৃষ্টিছাড়া,
কালিদাস হ'লো সারা, দিশেহারা প্রায় ॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মন রে! আমার এই মিনতি।
তুমি পড়া পাখী হও, করি স্তুতি ॥

* ইহাপেক্ষা স্বরূপ বর্ণনায় কে বাহাদুরি দেখাইয়াছেন? বহু বিশেষণে যাঁহাকে বর্ণনা করিয়া উঠা যায় না, দুই চারিটী কথায় তাঁহাকে নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন। স্বেচ্ছায় যাহারা এরূপ সহজ সাধনার পথ গ্রহণ না করিবেন, তাঁহাদের সিদ্ধি কি প্রকারে হইবে, তাহা সেই সিদ্ধিদাত্রীই জানেন।

যা পড়াই তাই পড় মন ! পড়লে শুনলে দুধি ভাতি।
(ওরে) জান না কি ডাকের কথা,না পড়িলে ঠেঙ্গার গুঁতি
কালী কালী কালী বল মন ! কালী-পদে রাখ প্রীতি।
(ওরে) পড় বাবা আত্মারাম ! আত্মজনের কর গতি ॥
উড়ে উড়ে বেড়ে বেড়ে , বেড়িয়ে কেন বেড়াও ক্ষিতি।
(ওরে) গাছের ফলে, ক'দিন চলে, কর রে চার
ফলের স্থিতি ॥
প্রসাদ বলে, ফলা গাছে, ফল পাবি মন ! শোন যুকতি।
(ওরে) ব'সে মূলে, কালী বলে, গাছ নাড়া দেও
নিতি নিতি ॥

——o——

সিন্ধু ভৈরবী—তাল একতালা।

একবার বল রে মন তারা।
কেন অনিত্য বিষয়ে ভুলে, হ'লি মাতোয়ারা ॥
সম্পদে কি আছে সুখ, আদি অন্তে তার দুখ,
ভেবেও তা বুঝলে নাক, হ'লে দিশেহারা ॥
বিষয়ে হইয়ে মত্ত, নষ্ট হ'লো পরতত্ত্ব,
না ভাবিলে পরতত্ত্ব, এ আবার কি ধারা ?
বাল্য যুবা হ'লো গত, বিষয়ের আশ মিটলো না ত,
কবে হ'বি অনুগত, ভেবে হই সারা।

* মূল মন্ত্রে জপ করিলেই কল্পবৃক্ষ নড়িয়া থাকে। এবং চারি ফল ঝরিতে থাকে।

মনকে বুঝান ভার, কালিদাস ভেবেছে সার,
মিছে কেন বল আর, বুঝেছি ওর ধারা ॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

তারা-তরী লেগেছে ঘাটে।
যদি পারে যাবি মন! আয় রে ছুটে ॥
তারা নামে পাল খাটায়ে, ত্বরায় তরী চল বেয়ে,
যদি পারে যাবি, দুখ মিটাবি, মনের গিরে দে রে কেটে।*
বাজারে বাজার কর মন! মিছে কেন বেড়াও ছুটে?
ভবে বেলা গেল, সন্ধ্যা হ'ল, কি কর্‌বে আর ভবের হাটে ॥
শ্রীরামপ্রসাদ বলে, বাঁধ রে বুক এঁটে সেঁটে।
এবার আমি ছুটিয়াছি, ভবের মায়া-বেড়ী কেটে ॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

ইথে কি আর আপদ আছে?
(এই তারার জমী আমার দেহ)
যা'তে দেবের দেব সুকৃষাণ হয়ে, মহামন্ত্রে বীজ বুনেছে ॥
ধৈর্য্য-খোটা, ধর্ম্ম-বেড়া, এ দেহের চৌদিক ঘেরেছে।

* মনের গিরা না কাটিলে (চিত্তশুদ্ধি না হইলে) সাধনার পথ পরিষ্কার হয় না মহর্ষি নারদ কৃত ভক্তি সূত্রাদি গ্রন্থ-রূপ বাজার হইতে প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহ করিতে হইবে।

এখন কাল-চোরে কি কর্ত্তে পারে,মহাকাল রক্ষক রয়েছে।
দেখে শুনে ছয়টা বলদ, ঘর হ’তে বাহির হ’য়েছে।*
কালীনাম অস্ত্রের তীক্ষ্ণ ধারে, পাপ-তৃণ সব কেটেছে॥
প্রেম-ভক্তিসুবৃষ্টি তায়, অহর্নিশি বর্ষিতেছে।
কালী-কল্পতরুবরে, চতুর্ব্বর্গ ফল ধরেছে॥
প্রসাদ বলে এখন আমার, ভয় ভাবনা দূরে গেছে।
কেবল কালী কালী কালীনাম, ঐ নাম সম্বল হ’য়েছে॥†

রাগিণী কালেংড়া—তাল কাওয়ালী

ভাল খেলা খেলিলে তারা! অবোধ ছেলে আমায় নিয়ে।
দিলে বা কি,পেলেম বা কি,কেবল আমি রইলাম স’য়ে॥
গেল বাল্য ছেলেখেলায়, যৌবন গত ভোগ বাসনায়।
বৃদ্ধকালে হায় হায়, জীবনটা যে যায় ব’য়ে॥
কালবশে কাল কাল-কামিনী! গত হ’লো দিবা যামিনী।
এখন যে আমার কাল-যামিনী,এলো গো মা নিকট হ’য়ে
কালিদাস কয় খেল্‌বো না আর,খেলার মর্ম্ম বুঝেছি সার
তারানামটী ক’রে সার, থাক্‌বো আমি স্থির হ’য়ে॥

* ছয়টা বলদ কামাদি ছয়টা রিপু। পাপরূপ তৃণের অভাবে বলদগুলি চলিয়া গিয়াছে।

† এই গীতটীর ১১শ ও ১২শ পংক্তি পূরণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে

রাগিণী ঝিঁঝিট্—তাল একতালা।

আয় মন! যদি শীতল হবি।
সাধু সঙ্গে, নানা রঙ্গে, আনন্দেতে প্রাণ জুড়াবি॥
বাসনা সুনিষ্ঠাজায়া, ও তার সুনিষ্ঠাকে হৃদি ধরিবি।
ধৈর্য্য নামে তার পুত্র, সে পুত্রেরে বশ করিবি॥
সাধুবাক্য ব্রহ্ম জেনে, সে বাক্য মত চলিবি,
এমন হলে তবেইত মন! সংসার লেঠা সব চুকাবি॥
ত্রিতাপে যদি হও তপ্ত, তাতে কি তুই কাজ হারাবি;
ত্রিতাপহারিণী তারা, সেই নামটি জপ করিবি॥
শ্রেষ্ঠ গীত প্রসাদ গীত, সে গীত গান করিবি;
একা যদি না পার মন! কালিদাসকে সঙ্গে লবি।*

রাগিণী ভৈরব—তাল পোস্তা।

দোষ করিলে রোষ করে না, আমার ন্যাংটা মাগী কালী
মায়ে যেমন করে যতন, জান ত সকলি॥
পাগলের মন যখন যেমন, তখনি যায় ভুলি।
দোষ করিলে রোষ করে না, তাঁকেই ত মা বলি॥

* যে সমস্ত গীত ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে; গায়ক মহোদয়গণ ইহার সুর নিজের সুবিধামত করিয়া লইবেন। তবে আমরা গায়কদিগের নিকট ঐ সমস্ত গান যে যে সুরে শ্রুত হইয়াছি—তাহারই উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রঃ—নিঃ—

ডাকিনী যোগিনী কত ভূতের হুলাহুলি।
(আবার) দেবের প্রধান বিষ্ণু ঈশান, তাঁরাও কৃতাঞ্জলি
প্রসাদ বলে নিজঞ্জালে যদি যাবে চলি।
(তবে) সকল ছেড়ে হৃদ্‌মাঝারে, ভাবরে মুণ্ডমালী ॥

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল পোস্তা।

তারা নাম, যে করে গান, তার কি বিপদ আছে রে ॥
সারাৎসারা তারা নাম, ঐ নাম সদা জপরে ॥
মহেশ জেনে নামের মর্ম্ম, করেনা আর কোন কর্ম্ম।
ছাড়িয়ে বৈদিক ধর্ম্ম, সন্ন্যাসী হয়েছে রে ॥
না পেয়ে চরণে স্থিতি, ব্রহ্মা বিষ্ণু সৃষ্টি স্থিতি,
শিবের সংহার মূরতি, বিপত্তি গিয়াছে রে ॥*
কালিদাস তাই সার ভেবেছে, তারানাম সম্বল করেছে,
যাতায়াত হবে না পাছে, এ কথা নিশ্চয় রে ॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মায়ের গুণ কে বল্‌তে পারে।
যাতে আগম নিগম হার মেনেছে,
আমি আর তা বলবো কি রে ॥

* তারাচরণে ব্রহ্মা বিষ্ণু স্থান পান নাই; এজন্য নানা ক্লেশকর সৃজন পালনের ভার এই দুইজনের উপরে ন্যস্ত হইয়াছে।

জগতজননী হয়ে, লজ্জা নাইকো তাঁর হৃদয়ে।
নইলে কি উলঙ্গ হ'য়ে, তাধেই তাধেই নাচ্‌তে পারে ॥
সবে বলে জগৎমাতা, কেটেছেন কি তাই ছেলের মাতা,
মায়ের কি নাই মমতা, এ তত্ত্ব কে বুঝ্‌তে পারে ॥
পশুপতি পতিররাজা, মায়ের কাছে কতই সাজা।
কালিদাস তাই দেখ্‌ছে মজা, সকল সময় হৃদয়পরে ॥

—o—

রাগিণী ঝিঝিট তাল—পোস্তা।

আর ভাল লাগেনা তারা, সহে না আর এ যাতনা।
কাতর হয়েছি বড়, করবো কি মা তাই বল না ?
ফেলেছ মা বিষম ফেরে, পাইনা কিছু ঠিক ঠিকানা।
কবে যে কিনারা পাব, ভাবিতেছি সেই ভাবনা ॥
মা হয়ে সন্তানের প্রতি, নিদয় হলে আর চলেনা।
তাই বলি করুণাময়ি! কৃপা করি পথ দেখাও না ॥
অন্তরে থাকিয়ে মাগো, অন্তরের কি ভাব জান না ?
(আবার)
জানিয়ে নিশ্চিন্ত আছ, কালিদাস ত তাও বুঝে না ॥

—o—

রাগিণী কেদারা—তাল আড়াঠেকা।

মহামায়ার দেখে মায়া, ভয় কর কি আমার মন ?
মায়াতে লইয়ে জন্ম, মায়ার ভয় কি কারণ ॥

জলচর জলে থাকে, জলে হয় তার দেহ সৃজন।
জলে তুফান হলে পরে, সে কি করে পলায়ন ?
বিষে জন্ম বিষকীট, বিষে করে দেহ ধারণ।
কে কোথায় দেখেছ বল, বিষের জ্বালায় তার মরণ ॥
যে চরণতলে শিব, সেই চরণে হও মগন। *
কালিদাসের মন যদি হও, ছেড়োনাকো ঐ চরণ ॥ †

—o—

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়াঠেকা।

বাস করা ভার হ'লো আমার এ দেহ ভিতর রে।
চৌদিকে বেষ্টিত শত্রু, কি করিব বল, রে ॥
বল্‌তে গেলে কালী তারা, অমনি তারা দেয় গো তাড়া,
মহামোহের পেয়ে সারা, সকল ভুলে যাইরে ॥
হয়েছি বিষম বন্দী, খুঁজে পাই না কোন সন্ধী,
কে বলিয়ে দিবে ফন্দী, পাইব সে পথ রে ॥
পেলেম যাহা গুরুর কৃপায়, সাধন বিনে বিফলে যায়,
কালিদাস তাই হায় হায়, করে সর্ব্বক্ষণ রে ॥

---

* শিব শব্দে মঙ্গল, চতুর্ব্বর্গ যে চরণে বিরাজ করে সে চরণ শিবময়। আবার (যার্থ যে চরণে সকল মঙ্গলময় শিব পতিত, সে চরণ ব্যতীত আর আশ্রয়স্থান কোথায় ?

† বেদান্তাদি শাস্ত্রে মায়া পরিত্যাগ করিয়া মুক্তি লাভের উপদেশ আছে। গীতরচয়িতা মায়ার আশ্রয়ে মুক্তি কামনা করিতেছেন। বিষয়টী বিবেচ্য নহে কি ? প্রঃ—নিঃ—

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়াঠেকা।

দীন দয়াময়ী তারা, ভবভয় হারিণি।
তুমি না করিলে দয়া, কে তারিবে তারিণী॥
মহেশাদিদেবগণ, ভূর্ভুবাদি ত্রিভুবন,
সকল তোমারি সৃজন, তুমি প্রলয় কারিণী॥
চরাচর দেখি যত, তোমা ছাড়া নয় কেহ ত,
বিশ্ব পূজায় হয়ে রত, আছি বিশ্বমোহিনী।
এই পূজাতে তুষ্ট হয়ে, ক'রো রক্ষা অসময়ে,
কালিদাসের ভব ভয়ে, ভরসা ভব-ভাবিনী॥*

রাগিণী জয়জয়ন্তী—তাল পোস্তা।

বাসনাতে দাও আগুণ জ্বেলে, ক্ষার হবে তার পরিপাটী।
কর মনকে ধোলাই, আপদ্ বালাই, মনের ময়লা যাবে কাটী॥
কালীদহের জলে চল, সে জলে ধোপ ধর্ব্বে ভাল,
(আর) পাপ কাষ্ঠের আকা জ্বালো, চাপাও রে চৈতন্য ভাঁটী॥

* পূজার সামগ্রীসম্ভার সংগ্রহ করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক মহামায়ার পূজা করা এখন-কার দিনে বড়ই কঠিন ব্যাপার, এই জন্য এই গীতরচয়িতা পূজার এই অভিনব উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। সহজ বুদ্ধিতে ইহা অতি সহজ বলিয়া বোধ হইলেও বিষয়টী গুরুতর; যেহেতু এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক সংসার, বিশ্বস্বরূপিনী মহামায়ার অবস্থান্তর ভিন্ন আর কিছুই নহে। সুতরাং সাংসারিক সমস্ত কার্য্য তাঁহা ছাড়া নহে। হৃদয়পটে এই চিত্র অঙ্কিত করিয়া প্রতি কার্য্যে ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার প্রতিবিম্ব দর্শন, কঠিন হইতেও কঠিনতর; ইহা বোধ করি কাহারই অবিদিত নাই। প্রঃ—নিঃ—

নীলাম্বর নীত জেনেছে, মনকে আমার বলা মিছে,
মনের পর কি শত্রু আছে, সেত হয়ত সোণা নয়ত মাটী॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মন কেন তুই এমন হ'লি।

(ও তোর)
ব্যাভার দেখে হাড়্ জ্বলে যায়, তাইতে তোরে পামর বলি॥
নিজের দোষ লক্ষ লক্ষ, তাতে তোমার হয় না লক্ষ্য,
(তুমি)
পরের দোষ দেখাতে দক্ষ, এই কি তোমার চতুরালি॥
পাঁচ ইন্দ্রিয়ের হ'য়ে রাজা, দিতেছ তার মত সাজা,
নাতান্ এখন সকল প্রজা,আর ক'রোনা মেজাজ্ আলি॥
কালিদাসের কাল ফুরায়েছে, অল্পকাল আর বাকী আছে,
আর কষ্ট দিওনা মিছে, বলাও এখন কালী কালী॥

রাগিণী জয় জয়ন্তী—তাল ঝাঁপতাল।

দিনে দীন দিন যাওয়া ভার, কি হবে গো নিস্তারিণী
কৃপা কর কৃপাময়ি! কাল ভয় নাশিনি॥
শুনি মাগো লোক মুখে, শিব বাক্য শুনি শুকে,
পরমযোগী হয় গো সুখে, তুমি মা তার বিধায়িনী॥

তন্ত্র মন্ত্র করে সার, কত জন হয়েছে পার,
গতি কি হবে না আমার, দীন ব'লে দীনতারিণী ॥
কালিদাস পাপভরে, দিবানিশি কেঁদে মরে,
কর নিষ্পাপ কৃপা করে, তুমি দুরিতবারিণী ॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

(আমি) কি গুণে মা বলবো তোরে।
কত দুঃখী তাপী নিন্দা করে ॥
(মাগো)
তোমার জন্য বাবা পাগল, বিমাতাকে মাতায় করে।
হ'য়ে হতবুদ্ধি খেয়ে সিদ্ধি, পদতলে আছে প'ড়ে ॥
মরেছিলে শতবারে, হাড় গেঁথে * তাই গলায় পরে।
(আবার) বুঝেনাকো বুড়ো বেটা, দুর্গা ব'লে কেঁদে মরে ॥
(ওমা) মোর কি বাপের সাধ্য, দশহাতে খাওয়াতে পারে।
সদা বাক্য জ্বালা দিস্ মা তারা, কেন মা তুই মোর বাপেরে ?
দ্বিজ রাম প্রসাদ বলে, লোকে নিন্দা করে মোরে।
(বলে)
মা যদি হয় অন্নপূর্ণা, অন্ন নাই কেন, তার বাপের ঘরে ॥

* বহুযুগে বার বার সতীর দেহত্যাগ হওয়ায় সেই সেই হাড় শিবের গলায় মালাকারে গাথা রহিয়াছে। প্রঃ—নিঃ—

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল ঠুংরি।

যার ভাবনা ভাব রে মন, সেত নয় সদয়া তেমন।
মা বটে তার নাইকো দয়া, শোন্ বলি তার দয়া কেমন,
সে যে প্রসব ক'রে, প্রাণ হরে, ভুজঙ্গী সন্তানে যেমন॥
মায়ের আদর পেলে পরে, সে ছেলে কি অনাদরে,
জন্মাবধি কেঁদে মরে, কে কোথা দেখেছে এমন॥
পাষাণেতে মায়ের জন্ম, তাইতে মায়ের এমন কর্ম্ম,
রামপ্রসাদ জানিয়ে মর্ম্ম, ঝরিছে তার দুনয়ন॥ *

রাগিণী ঝিঝি—তাল ঠুংরি।

মা বলে ডাকিস না রে মন, মাকে কোথা পাবিরে ভাই।
থাক্‌লে দেখা দিত আসি, সর্ব্বনাশী বেঁচে নাই॥
খুঁজিলাম ত্রিসংসারে, মায়ের উদ্দেশ্য পেলেম নারে।
এ কথা আর বল্‌বো কারে, প্রাণ করে আই ঢাই॥
গিয়ে বিমাতার তীরে, কুশপুত্তুল-দহন করে,
অশৌচান্তে পিণ্ড দিয়ে, কালাশৌচে কাশী যাই॥
কামাদি প্রবল আছে, তারা যদি শুনে পাছে,
তবে কি আর রক্ষা আছে, শুন হে প্রসাদের ঠাঁই॥ †

* এই গীতটীও অসম্পূর্ণ। ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম পংক্তি পূরণ করা হইয়াছে।

† এই গীতটীও অসম্পূর্ণ। ৩য় ও ৪র্থ, ৭ম ও ৮ম পংক্তি পূরণ করা হইয়াছে।

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

পিতৃ-ধনের আশা মিছে।
সে ধন পাবার কি আর উপায় আছে॥
পিতার দলিলদস্ত ধন সমস্ত, আগে বেনামি করেছে।
সকল ধন কুবেরকে দিয়ে, খ্যাপা সেজে ব'সে আছে॥
মায়ের ধন সন্তানে পায়, পিতা তাও দখল করেছে।
কেউ নেবে বলে যত্নে সে ধন, হৃদয়মাঝখানে রেখেছে॥
পিতা মোলে পুত্রে পায় ধন, ধর্ম্মশাস্ত্রে এই লিখেছে।
সেত নয় মরিবার পিতা, মৃত্যুকে সে জয় করেছে॥
শ্যামাচরণ স্বোপার্জ্জিত ধন, সঞ্চয়কর্ত্তার ভয় কি আছে।
সাধনের ধন কালরতন, সাধ্‌লে পায় পিতাই বলেছে॥

রাগিণী সিন্ধু ভৈরবী—তাল পোস্তা।

ন্যাংটা মাগীর এত আদর, জটে ব্যাটা ত বাড়ালে।
নইলে কেন নিশিদিবে ডাক্‌তে হবে মা মা বলে॥
শ্রীরাম জগতের গুরু, জটে ব্যাটা তার গুরু,
আপনি কে তা বুঝ্‌লে নাকো, পড়্‌লো গিয়ে পদতলে॥
বুঝি পাষাণে বেঁধেছে হিয়ে,বারেক তো দেখ্‌লে না চেয়ে,
এবার বুঝি মায়ে পোয়ে, এই রকমে যাবে চলে॥

মিছে জীবন হ'লো গত, মায়ের দয়া হ'লো না ত,
জেনেছি তার মনোগত, কেঁদে শ্রীরাম প্রসাদ বলে ॥ *

রাগিণী ললিত বিভাষ—তাল আড়াঠেকা।

কেমন করে মা আমারে ভুলাইবে এ সংসারে
শবাসনা ত্রিনয়না, পেয়েছি সেই সারাৎসারে ॥
শিববাক্য দৃঢ়করে, রেখেছি এই হৃদি পরে,
এখন আর মা কেমন করে, বাঁধিবে গো মায়াডোরে
গিয়াছে মা বহুজন্ম, কেটেছে মোর পূর্ব্বকর্ম্ম,
এখন মা জেনেছি মর্ম্ম, তব নাম ভরসা ক'রে ॥
যে না জপে কালীতারা, সেইত ভেবে হবে সারা,
কালিদাস তাই তারা তারা, দিবানিশি জপ করে ॥

রাগিণী রামকেলী—তাল আড়াঠেকা।

শুন হে শঙ্কর মম, আছে একটী নিবেদন।
ছেড়ে দাওগো মায়ের চরণ, একবার হৃদে করি ধারণ
হলাহল পান করি, তাই রেখেছ বক্ষে ধরি।
সংসার বিষে আমরা মরি, কর কৃপা বিতরণ ॥

* গীতটী অসম্পূর্ণ। ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম পঙক্তি পূরণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

তুমি নীলকণ্ঠ বিষে, দগ্ধ মোরা সংসার বিষে ;
এ যাতনা যায় গো কিসে ? তাই মাগি হে ঐ চরণ ॥
কালিদাসের মনোগত, অন্তর্যামী জেনেছ ত।
যুগলরূপে আবির্ভূত, হলেই হবে সব পূরণ ॥

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল খং।

মা বলে কেন ডাক মন ! সে মা ত নয় রে তেমন।
মিছে তুমি কেঁদে কেঁদে, ভাসাতেছ দুনয়ন ॥
ভুগিতেছ কর্ম্মফেরে, জাননা তোমার কর্ম্ম কেমন।
কর্ম্মবিপাক দেখ ভেবে, বুঝিবে কেন মা এমন ॥
কর্ম্মের খেলা খেল্‌তে দিয়ে, রয়েছেন মা লুকাইয়ে।
কেমনে পাবে খুঁজিয়ে, না দিলে সে দরশন ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, তাঁরাও ত এই খেলার ভিতর,
কতশত যোগীবর, হয়ে আছেন অচেতন ॥
কর্ম্মফল আগে ভুগে, তা হ'লে এই কলিযুগে,
নিস্তারিণীর পদযুগে, কর আত্ম সমর্পণ।
নইলে দয়া হবে না তাঁর, কালিদাস বুঝেছে সার,
তাই বলি বার বার, ক'রো না সে আকিঞ্চন ॥

রাগিণী ললিত বিভাস—তাল ঝাঁপতাল।

একটা ভূতে রক্ষা নাই মা,(আমার)পাঁচটা ভূতের বাসা ঘরে
বই রাৎপোহালে ভূতের বোঝা,নিতুই কে ভূতশুদ্ধি করে॥
অঙ্গন্যাস ভূতশুদ্ধি, বিনা হয় না পূজা সিদ্ধি,
হ'য়ে হতবুদ্ধি, খেয়ে সিদ্ধি, লিখেছে তোর ভূতেশ্বরে॥
তোর ভূতেশ্বর এখনি মরুক্, আপনি সে ভূতশুদ্ধি করুক,
জীবে তরুক বা না তরুক,
(মাগো) ভক্তিভাবে ডাক্‌বে তোরে॥
তোর কর্ম্ম যত সব অদ্ভুত, ভূতের ভিতর কল্লি ভূত,
দ্বিজ নীলাম্বর এম্‌নি ভূত,কেবল ভূতের বোঝা ব'য়ে মরে।

রাগিণী ললিত বিভাস—তাল ঝাঁপতাল।

যে মায়া দেখালি তারা, বুঝিলাম তা এত দিনে,
(ও তুই) দেখাচ্ছিস তোর জাতের ধর্ম্ম,
নইলে পাষাণী নাম বল্‌বে কেন?
রাখিতে পিতার ধর্ম্ম, পাষাণেতে নিলি জন্ম,
অন্যে কি বুঝিবে মর্ম্ম, উপমায় কি আছে হেন॥
তাইতে তুমি নিরুপমা, গিরিপুরে বলিত উমা,
এখন সবাই বলে উমা উমা, ভয়ে জড় সড় যেন॥

দেখিয়ে প্রাণ শিহরে, ভয়েতে হৃদি বিদরে,
কালিদাস কয় সকাতরে, মিছে আশা মাতৃস্নেহ ॥*

---o---

রাগিণী কালেংড়া—তাল কাওয়ালী।

কেন রে, আমার শ্যামা মাকে বল কাল।
সেত কাল নয়! রূপে জগৎকরে আলো ॥
কভু সিত, কভু পীত, কভু নীল লোহিত,
আমি বুঝ্‌তে নারি সে মা কেমন
(আমার) ভাব্‌তে জনম গেল ॥
কখন প্রকৃতি মাতা, কভু পুরুষ,
কভু বিশ্বব্যাপী নিরাকার, শূন্য মহাকাশ,
কান্ত বলে যেরূপ ভেবে মহেশ পাগল হ'লো ॥

রাগিণী ললিত বিভাষ—তাল ঝাঁপতাল।

এ আবার কল কেমন কল মা! যে কলে আমায় ফেলেছ।
কলে ফেলে বিকল ক'রে, আমারে খুব ভুলায়েছ ॥
দুষ্ট ছেলে ছিলাম ব'লে, বেঁধেছ মায়া শিকলে,
পাছে ডাকি মা মা বলে, পর্দ্দার ভিতর ঘুমায়েছ ॥

---

* উপমায় নাই বলিয়া গিরিরাজ নিরুপমা নাম রাখিয়াছিলেন কিন্তু "নিরুপমা" উচ্চারণ করা সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে সহজ নহে। এই হেতু উমা নামেই প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। সুতরাং "উমেতি মাত্রা তপসো নিষিদ্ধা" কুমারসম্ভবের এই উপপত্তি ব্যতীতও উমা নামের সার্থকতা দেখাইতে পারা যায়। প্রঃ—নিঃ—

দিয়াছ যে ছয়টা ইয়ার, তারা আমায় ক'ল্লে নাচার।
কাছ ছাড়েনা একবার, এ আবার কি কাচ্ কেচেছ॥
গুরু মন্ত্র করে সার, ঘুম ভাঙ্গাব এই বার,
তখন যে পাবেনা নিস্তার, তার ভাবনা কি ভেবেছ?
দ্বিজ কালিদাসে কয়, এরূপ করা উচিত নয়।
মা হ'য়ে হ'লে না সদয়, পাষাণে কি বুক বেঁধেছ?

রাগিণী সিন্ধুভৈরবী—তাল পোস্তা।

জ্ঞানে ব্রহ্ম না পাই দেখা, বুদ্ধি ক'রে যায় না জানা।
সে জনার ভাব ভাব্‌তে গেলে,
ভাবনাতে তার বাগ্ মানে না॥
সৃষ্টি হেরি সৃষ্টিপতি, অনুমানে হয় শকতি,
তাই বুঝি সে জগৎপতি, দেখায় আপন গুণপনা?
শক্তিধরের শক্তি হেরে, শক্তিহীনের প্রাণ শিহরে,
বারে বারে জীবের তরে, রূপ ধ'রে কি দিচ্চে চেনা॥
ধরা ব্রহ্ম বিষম দায়, শক্তি বিনা কেবা ধরায়,
ব্রহ্ম সনে শক্তি খেলায়, (যেন) বহ্নির সনে বহ্নিকণা॥*

* গুণপনা দেখাইয়া প্রতিপত্তি লাভ করা সাধারণ জীবের ধর্ম্ম, কিন্তু অসীম শক্তিমান ঈশ্বরের উপর তাহার আরোপ করিতে যাওয়া বড়ই গর্হিত কর্ম্ম। একারণ গীতরচয়িতার উল্লিখিত বিদ্রূপটী সুসঙ্গত নহে কি? প্রঃ—নিঃ।

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল একতালা।

তারা তারা বল রসনা, ভবে জনম আর হবে না।
পতিতপাবনী তারা, সেই নাম গেয়ে তুই চলে যানা॥
এসেছিলে আমার কাজে, কাজের কথায় কেন বাজে?
এ ব্যাভার কি তোমার সাজে, শোন্‌রে বলি ও রসনা!
কালিদাসে দেখে ব্যাকুল, তারে কি দিবে না কূল,
যদি পাঁচজনে হও অনুকূল, তবেই ত আর কি ভাবনা?*

——o——

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

এবার মনের দোষে হলেম্ মাটি।
মন আমার, কিছুতেই হল না খাঁটি॥
আমি বলি এস রে মন, ভাবি ব্রহ্মময়ীর চরণ দুটি।
(আমার) সে কথায় মন কাণ করে না,
করে বেড়ায় ছুটা ছুটি॥
শয়ন ভোজন বসন ভূষণ, তদ্বিষয়ে হয় না ত্রুটি।
ইষ্টসাধন করে না মন, মরে ভূতের বেগার খাটি॥
প্রসাদ বলে মনকে আমার, সার্‌লে জুটে ইয়ার ছ'টি।
এরা মনের সঙ্গ ছাড়ে না কো, দিন ত আমার গেল কাটি॥

* "ভগবন্নামৈব কেবলং" এই বাক্যে বুঝা যায় যে, কর্ণাদি পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে রসনা দ্বারা বিশেষরূপ ইষ্ট সাধিত হইয়া থাকে। এ জন্য গীতরচয়িতা রসনাকে অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু অবশিষ্ট ইন্দ্রিয়গুলি প্রতিকূল হইলে ইষ্টসিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটে। বলা বাহুল্য যে, অন্য ইন্দ্রিয়ের অনুকূলতা বিশেষ প্রয়োজনীয়। প্রঃ—নিঃ।

"অসীম মম পাপঞ্চ অসীমা করুণা তব।
সভয়ং কালি! পশ্যামি কং কো বা পরিলঙ্ঘয়েৎ॥"

রাগিণী পূরবি—তাল আড়াঠেকা।

দেখিব তারিণি এবার কে জিতে কাহারে।
(কে জিনে কাহারে এবার, কে জিনে কে হারে)
আমার পাপের নাইকো সীমা, অসীম তব মহিমা,
বুঝিব কাহার গরিমা, কে জিতে কে হারে॥
আমি হই হীনশক্তি, তুমি যে মা আদ্যা শক্তি
আশ্রয়ে না পেলে শক্তি, জিনিতে কে পারে॥
"খুঁটার জোরে ম্যাড়া লড়ে" কথাটি যদি যায় ন'ড়ে,
তবে আজি এ সমরে, চিরজিতা হারে॥
শুন গো, নগেন্দ্র বালা, এ যে দেখি বিষম জ্বালা।
মিশিবে কলঙ্ক মালা, নরমুণ্ড হারে॥
দ্বিজ কালিদাসে কয়, সহজ কথা দৈত্যজয়।
তাদের পাপ ত অসীম নয়, ওগো সারাৎসারে॥ *

---

* উপরের শ্লোকটি মহারাজ স্তর যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহোদয় কর্তৃক রচিত। উঁহার মর্ম্মার্থ গ্রহণ করিয়া উক্ত গীতটী সঙ্কলিত হইয়াছে।

জীবের বাসনা-বৈচিত্র্য দেখিলে সকলকেই বিস্মিত হইতে হয়। স্বীয় পাপ অসীম হইলেও শক্তিহীনের জয় সম্ভাবনা কোথায়? "কথাটী যদি যায় ন'ড়ে" কেবল এই ভরসায় মুণ্ডমালিনীর মুণ্ডমালায়, কলঙ্ক কালিমা দিবার জন্য যিনি অগ্রসর হইয়াছেন তিনি যে কেবল উপহাসাস্পদ হইবেন, সে পক্ষে আর সন্দেহ কি? কিন্তু এরূপ উপহাসাস্পদ হওয়াই কি গীতরচয়িতার আন্তরিক অভিপ্রেত নহে? প্রঃ—নিঃ—

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল একতালা।

আর তারা নাম লব না মা! দেহে জীবন যত দিন।
নামের ফল ফ'লেছে ভাল, ক্রমে ক্রমে হ'লেম দীন॥
আশা ভরসা কিছু নাই আর, নাম মাত্র হয়েছে সার।
এখন গো বুঝেছি ব্যাপার, নামের গুণে সকল হীন॥
এ দেহ ছাড়িয়ে যাব, তোমারই সাযুজ্য পাব।
তখন তোমায় নাম শুনাব, প্রেমানন্দে চিরদিন॥
কালিদাসের মনস্কাম, মানসে জপিব নাম,
রসনা তায় হ'ল বাম, সে ত নয় আমার অধীন॥

রাগিণী সাহানা—তাল একতালা।

একি অসম্ভব শুনি কথা!
কৈলাস ছেড়ে, আমার ঘরে, এসেছেন জগন্মাতা॥
আমি অতি মূঢ়মতি, না জানি স্তুতি ভকতি।
কৃপা করি শিব সতী, আসিবেন কি হেথা?
যে পদ্ম নারদ ঋষি, ধ্যান করে দিবানিশি।
মিলিবে তাই ঘরে বসি, কে শুনেছে কোথা?
দেখি দয়া ক্রিয়াহীনে, কালিদাস ভাবে মনে,
মা নহিলে সন্তানে, কে করে এত মমতা? *

* প্রথম দুই পংক্তি প্রাচীন, বাকীগুলি পূরণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

রাগিণী কালেংড়া—তাল আড়াঠেকা।

এস মা আনন্দময়ি! ব'সো হৃদিপদ্মাসনে।
মানসোপচারে পূজা দিব ঐ রাঙ্গাচরণে॥
কামাদিরে কৃপাকরি, লহ যদি ক্ষেমঙ্করি!
তবে কি আর শঙ্কা করি, মানসপূজার আয়োজনে॥
তারা বড় বাদ সাধে, তাই মা পড়ি প্রমাদে,
পদস্খলন প্রতি পদে, সেই ভয় হয় মনে॥
তুমি মা ভয়হারিণী, শরণাগতপালিনী,
তাই সে ডাকি তারিণী, কর রক্ষা দীনজনে।
কালিদাসে কৃপা করি, কর দয়া শুভঙ্করি!
তবে আর কাহারে ডরি, ভ্রমিব নির্ভয় মনে॥

—০—

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল যৎ।

নিশি জাগিয়ে পোহাও মায়ের গুণ গেয়ে।
কি সুখ চৈতন্যদেহে অচৈতন্য হ'য়ে॥
নিদ্রাতে কি আছে ফল, মহানিদ্রা নিকট হ'লো।
তখন মনের সাধে, সাধ মিটাবে ঘুমায়ে।
যদি না ঘুমালে নয়, যোগনিদ্রা উচিত হয়,
তারারূপ স্বপনে দেখ, নয়ন মুদিয়ে।
কমলাকান্তের চিত, বৃথা সুখে অনুরত,
সকল সুখের সুধানিধি, (ঐ) গিরিরাজমেয়ে॥

রাগিণী মূলতান—তাল একতালা।

ফাঁকি দিবে কি আমারে ? (ওমা ভেবেছ কি তুমি)
আমি সিদ্ধসেবায় বদ্ধ আছি, অসিদ্ধ কে করে ॥
জান ভাল সার্ত্তে পরে, না জান মা আপ্ত সারে।
আমি মূল ধরে টান্ দিব যখন, থাকবে কেমন ক'রে ।
ঐ পদে জোর ক'রে ফিরি, থাকি জোরে জোরে।
জানি মুক্ত হওয়া সহজ কথা, আর কি দিবে মোরে ॥
প্রসাদ বলে হৃদ্‌কমলে, বেঁধেছি তোমারে।
তুমি ছাড়াও দেখি, পার, কেমন রামপ্রসাদের গিরে ॥

—o—

রাগিণী ললিতবিভাস—তাল ঝাঁপতাল।

শোন মা তারা হ'য়ে সারা,
ডাকবো না আর মা ! তোমারে।
কর্ম্মবন্ধন বিধির লিখন, যদি ভুগ্‌তে হয় আমারে ॥
যে ভুগিবে কর্ম্মফল, ভক্তিতে তার কিবা ফল।
বৃথা তার নয়নজল, দরদরিত বহে ধারে ॥
যোগীতে করিবে যোগ, ভোগিজনে করে ভোগ।
কে এড়াবে কর্ম্মভোগ, এ কথা সুধাব কারে ॥
দ্বিজ কালিদাসে কয়, কালীনামে কর্ম্মক্ষয়।
নাইকো ইথে সংশয়, জানাব মা যারে তারে ॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মন ভুলো না কারো কথায়।
কথায় ভুল্লে কিন্তু আসল হারায়॥

যে যা বলে তাই শুনে মন! ঘরে আগুন কে দিতে চায়।
আপন বুঝ পাগলে বুঝে, পরের কথায় কি এসে যায়॥
যে পথ ইচ্ছা সেই পথে যাও, না হাঁট্‌লে কি পথ ফুরায়?
যথা যেতে আবশ্যক হয়, বাজে কি তায় পথের কাঁটায়?

আপন আয়ু, পরের ধন মন!
দেখিতে কি তায় কম দেখা যায়।
ও রে যার যে নাম সেই তা বলে,
অন্য নামে কেউ না বিকায়॥

প্রসাদ বলে সোজা পথ, পেলে পরে, বাঁকায় কে যায়?
ধ'রেছ যা ধ'রে থাক, ছেড় না প্রাণ থাকে কি যায়॥

বাউল সুর।

দুর্গা দুর্গা বল আমার মন! ও তোর শিয়রে ব'সে শমন।
(ও তোর) দিন ফুরাল, সময় গেল, হ'ল না সাধন।
ও তুই বুঝিস্ না রে, বলিলেও ত শুনিস্ না রে,
আমায় তুই ফেল্‌বি ফেরে, বুঝেছি এখন॥

গর্ভবাসে ছিলে হে যখন,
আরনা আরনা ব'লে কত করেছ রোদন,
এখন তোমার হয় না কি স্মরণ ?
প্রসব হয়ে ভূমিতলে, ভাসালে বুক নয়নজলে,
ওনা ওনা ওনা বলে করিলে ক্রন্দন ॥ *
তরী ভাস্‌ছে সাগরে,
মিলেযুলে চল রে ভাই যাব ওপারে,
হেথা আস্‌ব না ফিরে,
পাবি রে দক্ষিণে বাতাস ভয় কর কারে ?
শুন কালিদাসের কথা, পাবে না আর মনোব্যথা
উজান চ'লে যাবে তরী, হবে না মগন ॥

রাগিণী সুরট মোল্লার—তাল একতালা।

কি সাধ্য আমার, শুধিবারে ধার,
জননী তোমার বর্ণিব মহিমা।
(তোমার) পলকে প্রলয়, পুনঃ পুনঃ হয়,
বেদসমুদয় গাহিছে গরিমা ॥

* সুতিকাগারে ভ্রষ্টযোগী বালক "ওনা ওনা" বলিয়া ক্রন্দন করিয়া থাকে, সেই অবশ অচৈতন্যাবস্থায় গর্ভবাসের যন্ত্রণাগুলি স্মরণ করিয়া "এ যাতনা আর দিও না!" এই বাক্যটীর চুম্বক বার বার "ওনা ওনা" এই শব্দে ক্রন্দন করিতে থাকে।

ভূদেবের শক্তি, গায়ত্রী রূপেতে, *
সর্ব্ব পাপক্ষয়, সে মন্ত্র জপেতে,
শৈত্যরূপা তুমি, থাক গো চন্দ্রেতে,
সূর্য্যে আবার দেখি, বরণ রক্তিমা ॥ †
ব্রহ্মা বিষ্ণু আদি, দেব মহেশ্বর,
তোমারি কৃপাতে, ত্রৈলোক্য ঈশ্বর,
দেব পুরন্দর, হ'লেন বজ্রধর,
কালিদাস তাঁর, পাইবে কি সীমা ॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মা এটা কি দেখ্ছ ব'সে।
(ও মা) পঞ্চজনায় তোমায় দোষে ॥
তেল থাকৃতে নিবায় বাতি, ছটা গুব্রে পোকা এসে
(এদের) ছটা পোকার ছটা গুণ মা,
এক্ এক্ গুণে লাগায় দিশে ॥
এরা—আমার ঘর আজ্, ক'রবে আঁধার,
তাইতে আস্ছে ঘেঁসে ঘেঁসে।

* গায়ত্রী জপ হেতু ব্রাহ্মণগণ মানব হইয়াও ভূদেব।

† জগতে যত প্রকার শৈত্য আছে তাহার হেতু চন্দ্র, ও যত প্রকার উত্তাপ আছে তাহার হেতু সূর্য্য। চন্দ্র ও সূর্য্যের শক্তি মূলপ্রকৃতি।

যদি তারা থাক্‌তে, আঁধার দেখি, বিপক্ষ বেড়াবে হেসে ॥*
প্রসাদ বলে আলোয় আছি মা, আলো নিয়ে যাব দেশে।
আমি মুদ্‌বো তারা দেখ্‌বো তারা, তারা অন্ধকার বিনাশে ॥

—o—

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মা তোমারে বারে বারে জানাব আর দুঃখ কত ?
ভাসিতেছি দুঃখনীরে, স্রোতের সেহালার মত ॥
জন্মে জন্মে যে যন্ত্রণা সকলি ত নিবেদিত।
তবে কেন পুনঃ পুনঃ ফিরিতেছি অবিরত ॥
ভবসাগরে তুফান ভারি, মন মাঝি তায় আনাড়ি,
এবার বুঝি দেহতরী, ডুব্‌ল চিরদিনের মত ॥
দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে, মা বুঝি নিদয়া হ'লে,
দাঁড়াও গো দ্বিজমন্দিরে, দেখে যাই জনমের মত ॥ †

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মন যদি মোর ঔষধ খাবা।
আছে শ্রীনাথ দত্ত পটল সত্ত্ব, মধ্যে মধ্যে ঐটি চাবা ॥

* এখানে কামাদি ছয় রিপু বিপক্ষ, ইহারা আমাকে জয় করিবার জন্য সর্ব্বদা যত্ন করিয়া থাকে।

† এই গীতের ৩য়, ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ, পংক্তি পূরণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

কামাদি কুপথ্য যত, আর ক'রো না তাদের সেবা।
তুমি দিব্য করে ত্যজ্য কর, তবেই তো আরোগ্য হবা॥
কালীনামামৃতলেহ, পান কর অহরহঃ।
(তোমার) সকল বিকার যাবে দূরে,
অমনি নিশ্চিন্ত হবা॥
সৌভাগ্য করিয়ে চূর্ণ, মৃত্যুঞ্জয়ের কর সেবা। *
রামপ্রসাদ বলে তবেই ত মন, ভবরোগে মুক্ত হবা॥ †

রাগিণী সিন্ধু ভৈরবী—তাল একতালা।

জয়দে মা কালি! বরদে মা কালি!
হয়েছি মা আত্মহারা, জান তো সকলি॥
বাল্যকালে ক্রীড়া রসে, যৌবনে যুবতী বশে,
গেল মিছে রঙ্গ রসে, (মাগো!) ফুরালো সকলি॥
কোন্ দিন আসিয়ে কাল, ঘটাবে বিষম জঞ্জাল,
দেখ্‌বে না আর কালাকাল, (সে যে) ল'য়ে যাবে চলি॥
কালিদাস তাই ভেবে আকুল, তারে কি দিবে না কূল,
একি শুভঙ্করীর ভুল (মাগো!) তাই তোমারে বলি॥

* ব্যাধি পক্ষে সৌভাগ্য অর্থে শুঁঠ ও মৃত্যুঞ্জয় নামক ঔষধ। অধ্যাত্ম পক্ষে সৌভাগ্য অর্থে পুণ্য ও তাহার চূর্ণ অর্থাৎ ক্ষয়এবং কর্ম্মক্ষয়ে মুক্তি।

† এই গীতে ৩য়, ৪র্থ ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম পংক্তি পূরণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

রাগিণী সিন্ধু ভৈরবী—তাল একতালা।

অন্নদে, মা অন্নদে !
নায়ে দেয় ক্ষুধায় অন্ন, ক'ল্লে অপরাধ পদে পদে॥
মোক্ষ প্রসাদ দে গো অম্বে ! এ সূতে মা অবিলম্বে,
কত আর নিরালম্বে, ভ্রমিব মা কেঁদে।
জঠরের জ্বালা আর, সহে না জননী আমার,
কাতরা হ'য়ো না আর, এ দীন প্রসাদে॥ *

রাগিণী কুকুভ—তাল ঠুংরি।

আমরা যাব করিতে শ্যাম দরশন।
হেরে সে ধন, হবে মনোবাঞ্ছা পূরণ॥
সে যে রাজা হ'য়েছে, মথুরাধামে,
কুব্জা দাসী রাণী, ব'সেছে তার বামে।
দেখি, দেখে মান্ রেখে, যদি করে সম্ভাষণ,
ব্রজের দুঃখের কথা (মোরা) ব'লব তখন।
কেঁদে অন্ধ হ'ল, নন্দ নন্দরাণী,
রাধা আছে কি না আছে অনুমানি।
শুনিয়ে কেশব সব, দুঃখ বিবরণ,
দেখি করে কি না করে, প্রত্যাগমন॥

* ৫ম ও ষষ্ঠ পংক্তি পূরণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

যদি প্রিয়ভাসে, না আসে বংশীধারী,
তবে ক'র্‌ব সবে, (মোরা) আইন জারী।
রীতিমত দাসখত লেখা, দেখায়ে সমন,
সেই জোরে মনোচোরে (মোরা) ক'র্‌ব বন্ধন
সব সখী মিলে ধ'রে আন্‌বো তারে,
দেখি বাধা দিয়ে কেবা রাখ্‌তে পারে,
এমন পলাতক খাতকেরে, শাসন কারণ,
রাই রাজদরবারে (মোরা) ক'র্‌বো অর্পণ ॥ *

রাগিণী সুরট্‌—তাল একতালা।

কে শবাসনা, করাল বদনা,
হয়ে দিগ্‌বসনা, সমরে নাচিছে।
সুরাসুর নর, করি যোড়কর, পদতলে হর,
কি শোভা শোভিছে।
বরাভয়করা, তবু ভয়ঙ্করা,
অসি মুণ্ডমালা, রুধির ঝরিছে।

* কবিবর ঈশ্বর গুপ্ত ও সঙ্গীতজ্ঞ মহেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় উভয়ের সম্মিলনে মণি-কাঞ্চনের ন্যায় প্রাণস্পর্শী ভাবে ও সুরে উপরি উক্ত সঙ্গীতটী সংগঠিত হইয়াছে, ইহা সহৃদয় পাঠকগণকে উপহার না দিয়া মনের তৃপ্তি হয় না।

অট্ট অট্ট হাসে, ত্রিভুবন ত্রাসে,
নয়ন ত্রিতয়ে, তপন শোভিছে ॥
ডাকিনী যোগিনী, তারাও উন্মাদিনী,
হইয়ে সঙ্গিনী, আনন্দে মেতেছে।
হৃদিপয়োধরে, কতই সুধা ক্ষরে,
যেন গিরিবরে, জাহ্নবী ঝরিছে ॥
কর্ণে শিশু দোলে, মাভৈঃ মাভৈঃ বলে,
ধায় এলো চুলে, মেদিনী কাঁপিছে।
শিবসিমন্তিনী, ত্রিতাপহারিণী,
কালিদাস হৃদি, সদা বিরাজিছে ॥ *

—০—

রাগিণী সিন্ধু ভৈরবী—তাল পোস্তা।

বাজ্‌বে গো মহেশের বুকে, নেবে নাচ্ না খ্যাপা মাগী।
মরেন্ নাই শিব আছেন বেঁচে, ধ্যানে আছেন মহাযোগী ॥
বিষে তনু জর জর, সহে না আর পদ ভর,
নাবো নইলে ভাঙ্‌বে পাঁজর, কি করিস্ গো শিব-সোহাগী।
বিষ পানে যার হয় না মরণ, সে আর মর্‌বে কিসের কারণ,
রামপ্রসাদ বলে কপট মরণ, অভয় চরণ পাবার লাগি ॥

* বাৎসল্য প্রভৃতি নবরসের এরূপ একত্র সমাবেশ আর কোথাও দেখা যায় কি?

রাগিণী মূলতান—তাল একতালা।

(ও মন !) তুই কোন সাধনে যাবি,
ও তোর সাহস দেখে ব'সে ভাবি।
কত শত মহাজনে, তারা কাণ্ডারী বিহনে,
অকূলেতে প'ড়ে খাচ্চে খাবি ॥

সে ত্রিবেণীর ঘাটে ঘাটে, দুয়ার আঁটা তিনটা কাটে,
ভাব জলুয়ে আঁটা আছে, রূপ রসের কপাটে।
তাহে শব্দ গন্ধ কল, প্রেমেরি শিকল,
স্থানে স্থানে আছে উল্টা চাবি ॥

ব্রহ্মা বিষ্ণু ত্রিলোচনে, সত্ত্ব রজ তমোগুণে,
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কর্ত্তা, এ চৌদ্দ ভুবনে;
তারা না জানে কখন, ও সেই ত্রিবেণী কেমন,
ত্রিগুণাৎপর সে আজ্গোবী ॥

মহাবিষ্ণু গুণাতীত, হয়ে মহামায়াবৃত।
শেষ শয্যায় নিদ্রাগত হ'য়ে অভিভূত।
পেয়ে ত্রিবেণীর আভাস, স্বয়ং শ্রীনিবাস,
নন্দের ঘরে এসে চরায় গাভী ॥

শচীসূত বল যারে, ত্রিবেণীর ঢেউ লেগেছে তারে,
সেই জোয়ারে ভেসে এসে, ফির্‌ছে দ্বারে দ্বারে।

ও তার যদি যেতে থাকৃত শক্তি, ক'রবে কেন ভক্তি,
কাঁদবে কেন হ'য়ে ভাবের ভাবী ॥
দুই দিকে দুই বিষের নদী, বহিতেছে নিরবধি,
মধ্যেতে অমৃত নদী, চিন্তে পার যদি।
গোঁসাই প্রেমচাঁদে বলে, ও তার মধ্যে ডুব্‌লে মেলে,
নইলে বিষ খেয়ে তুই প্রাণ হারাবি ॥

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়াঠেকা।

ওরে আমার অবোধ মন! বসিয়ে কি কর রে।
মহামায়া অন্নপূর্ণা, এই স্থানেতে বিরাজ করে ॥
কাশীনাথ বিশ্বেশ্বর, মহাদেব মহেশ্বর,
ব্যোম ব্যোম হর হর, বল সর্ব্বক্ষণ রে।
ব্যোম ভাবে হও মত্ত, ব্যোমেতে হয় পরম তত্ত্ব, *
না বুঝিলে ব্যোম তত্ত্ব, পাবে না সে পথ রে ॥
কিবা রূপ অপরূপ, হের রূপ মাধুরী!
জনম সফল কর, ঐ চরণে পূজা করি;
তবে ত হইবে মম, সার্থক জীবন রে।

* যিনি ব্যোমভাবে নিবিষ্ট হইয়াছেন, তিনিই পরম তত্ত্ব লাভ করিয়াছেন। স্থান মাহাত্ম্যে কি না হইতে পারে? গীতরচয়িতা ক্ষিত্যপতেজো-মরুদ্ব্যোম ব্যতীত ব্যোমতত্ত্বের কোন ধারই ধারিতেন না—কিন্তু পুণ্যক্ষেত্র বারাণসীধামে অবস্থিতি কালে তিনি এই গীতটি রচনা করিয়া স্বাবলম্বনবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। প্রঃ—নিঃ—

হইয়ে তব অধীন, কালিদাস হয়েছে দীন,
তাই তোমারে প্রতিদিন, বুঝাই কত মত রে

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

এই হলো মা তোমায় সেবে।
(আমার) গেলো জন্ম ভেবে ভেবে ॥
দিনে দিনে দিন যাওয়া ভার, ভাবিতেছি নিশি দিবে।
(ও মা !) তুমি ত নিশ্চিন্ত আছ, আমি
আর দিন পাব কবে ?
শিব বাক্য সত্য জেনে, ছিলাম নিশ্চিন্ত মনে।
এখন দেখে শুনে হচ্ছে ভয়, অন্তিমেও কি এমনি হবে
ব্রহ্মাণ্ডের ভার বইতে পার মা !
আমার ভার কি বড়ই লাগে ?
নইলে আমার বেলায় উল্‌টা ভাব,
কেনই বা তুমি দেখাবে ?
কালিদাস কয়, আমায় যদি, এম্‌নি ফাঁকী দিবে।
তোমার নামেতে কলঙ্ক হবে, বুঝে দেখ ওমা শিবে !

রাগিণী বাগেশ্রী—তাল আড়াঠেকা।

কি আর দেখাবে তারা! অনিত্য সংসারে।
দেখাও বাজীকরের বাজী, যে না বুঝে তারে॥
মায়াতে হইয়ে মত্ত, যে জন সদা ফেরে।
দেখাও তারে বিধিমতে, ছাড় গো আমারে॥
আপনি সাজিয়ে সং, দেখাচ্চ মা কত রং।
আমায় আর করো না ভরং, যাব ওপারে॥ *
মায়ে পোয়ে এইবার, বুঝিব দরদ কার।
চিনে লব আপনার, সেই পরাৎপরে॥
কালিদাস মূঢ়মতি, হইয়ে কাতর অতি।
চরণে করে মিনতি, ডাকে গো তোমারে॥

রাগিণী ইমনী কল্যাণ—তাল কাওয়ালী:

তারা! তোমার চরণে নমস্কার।
কারে সদয়, কারে নিদয়, বুঝে উঠা ভার॥
যে জন তোমায় আপন ক'রে, রাখে সদা হৃদি'পরে,
হয় না দয়া তার উপরে, সে যে হয় নাচার।

* যোগী ও ভোগীর মধ্যাবস্থা বড়ই কষ্টকর; যেমন বাসনের মধ্যে না পিতল না কাঁসা, ভরং উপেক্ষণীয়।

প্রমাণ তার কিবা দিব, পদতলে পড়ে শিব,
দুঃখের কথা কি বলিব, যেন শবাকার।
প্রসাদাদি ভক্তগণ, কত বা করেছে রোদন,
সে সব কথা হলে স্মরণ, দেখি অন্ধকার।
কালিদাস প'ড়ে দুর্দ্দিনে, ডাকে তোমায় নিশি দিনে,
এখন সে মা কৃপা বিনে, হয়েছে অসার॥ *

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

ডাক দেখি মন তেমনি ক'রে।
যাতে মা আমারে দয়া করে॥
ডাকের মতন ডাকলে পরে,
সে মা কি আমার থাকতে পারে?
কেন তুই তা বুঝিস্ না রে, বারে'বারে বল্লে পরে॥
দয়াময়ী মা যে আমার, আছেন তিনি জগৎ জুড়ে।
তাঁর কাছেতে পেয়ে দয়া, তাইতে সবে দয়া করে॥
কালিদাস কয় নিশি দিনে, ডাক তুমি ভক্তিভরে।
মায়ের দয়া পেলে পরে, সকল দুঃখ যাবে দূরে॥

---

* যে সাধনায় অগ্রসর হইয়া মহাত্মা রামপ্রসাদকেও বলিতে হইয়াছে "চাক্‌লা জুড়ে নাম রটেছে, শ্রীরামপ্রসাদ মায়ের বেটা। মায়ে পোয়ে, এমন ব্যাভার, ইহার মর্ম্ম বুঝবে কেটা" সে সাধনায় সাদৃশ অধমদিগের কিরূপ বিপত্তি সহৃদয়গণ হৃদয়ঙ্গম করিবেন।

রাগিণী সাহানা—তাল ঝাঁপতাল।

কেন মন! হও বিষণ্ণ, প'ড়ে বিপদ সাগরে।
ভক্তি-ভরে, উচ্চৈঃস্বরে, সেই শ্যামা মারে ডাক রে॥
দূরে যাবে সব আপদ, বিপদের হবে বিপদ,
তখন তোমার ব্রহ্মপদ, হবে তুচ্ছ বোধ রে॥
সম্পদে কর না নাম, এই তার পরিণাম,
এখন তুমি ঘনশ্যাম, হৃদি' পরে ভাব রে॥
যা হবার তা হ'য়ে গেছে, এখনও সময় আছে,
যাবে যদি মায়ের কাছে, (তবে) যাত্রা করি ব'স রে
কালিদাসে সঙ্গে লয়ে, যাবে তুমি সেথো হয়ে,
নইলে জনম যাবে ব'য়ে, চিরদিনের মত রে॥

রাগিণী মালকোষ—তাল একতালা

মায়ের নাম লইতে অলস ক'র না,
রসনা—যা হবার তাই হবে।
(দুঃখ পেয়েছ আমার মন রে! কি না আর পাবে)
ঐহিকের সুখ হ'ল না বলিয়ে, ঢেউ দেখে কি না ডুবাবে?
রেখ রেখ, নাম, সদা সযতনে,
নিও রে নিও রে নাম, শয়নে স্বপনে।

সচেতন থেক' (আমার মন রে !) কালী ব'লে ডেক'
এ দেহ ত্যজিবে যবে ॥
তারা তারা বুলি জপ অনিবার,
ভবে যাতায়াত হবে না কো আর।
কিম্বা যদি পার, স্মর গঙ্গাধর, সকল দুঃখ এড়াবে ॥
বহু জন্ম পরে আসিয়ে এ ঘরে,
পুনঃ কি যেতে হবে রে ফিরে ?
প্রসাদের মন হও সযতন, প্রাণ যদি জুড়াবে ॥ *

—০—

প্রসাদী সুর।

মন ! তুই মাঝি এ দেহ-তরীতে,
(দেহ-তরীতে, দেহ-তরিতে)
যদি ভব নদী চাও রে তরিতে।
তবে গুরু বস্ত্র মাস্তুলে, ভক্তিরজ্জু বাঁধ ত্বরিতে ॥
পাঁচখান কাঠের নৌকাখান, চৌদ্দপোয়া পরিমাণ,
গড়েছে রসরাজ মিস্ত্রীতে। †
(ও তার) ছজন কুজন দাঁড়ি, প্রেম গুণে বশ করি,
রাখ নিজ নিজ গুণে কর্ম্ম করিতে ॥

* এই গীতের ৯ম, ১০ম, ১১শ, ১২শ, ১৩শ, ও ১৪শ পংক্তি পূরণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

† ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম, এই পাঁচখানি কাষ্ঠ।

দুর্গা নামের সারি গাও (মন !) ভবভয় নিবারিতে।
দৈব ঝড় তুফানে পড়ি, দেখ' যেন ডুবে না তরী,
ভুল না ধর্ম্ম-নিষ্ঠা হাল ধরিতে ॥
মায়া-রূপা ঘুরুণীর জলে, ডুবিবে তরী পড়িলে,
গাঙের বারি চিনে চল স্বরীতে।
তায় সাধু কৃপা-বায়ু বলে, তারা নামের বাদাম তুলে,
বাহ্ ডহ্ রহ্ জল হরিতে।
এবার মহাজনের ধন বাঁচাও (মন!) দাস কৃষ্ণধনে তরিতে ॥

রাগিণী বেহাগ—তাল যৎ।

অব্যক্ত নির্গুণ ব্রহ্মবস্তু নিরঞ্জন।
তদিচ্ছায় সত্ত্বরজতম তিন গুণ ॥
সাধন সুলভ্ হেতু কৃপা বিতরণ।
ত্রিগুণযুক্ত হ'লে পঞ্চমূর্ত্তি প্রকাশন ॥
শিব শক্তি বিষ্ণু সূর্য্য দেব গজানন।
রূপ ভিন্ন বস্তু এক সাধন কারণ ॥
যাহার যে রূপে বাঞ্ছা কর আরাধন।
পঞ্চবিধ তত্ত্ব শ্রুতি স্মৃতিতে রটন ॥
রিপু পরাজয় করি কর অবিদ্যা-বর্জ্জন।
ভক্তিভাবে কর সদা সগুণ সাধন ॥

দৃঢ় ভক্তি বিনা মুক্তি নহে কদাচন।
সেই সে পরম তত্ত্ব রচে অকিঞ্চন ॥ *

* আমরা বাল্যকাল হইতে মহাত্মা দেওয়ান মহাশয়ের গীতিপারিপাট্য শ্রুত হইয়া আসিতেছি। কিন্তু অকিঞ্চিৎ বঙ্গভাষার উপরে অকিঞ্চনের অনুরাগ দেখিলে. বড় বড় কিঞ্চনকেও বিস্ময়াভিভূত হইতে হয়। নিবিষ্ট চিত্তে উপরের গীতটী যিনি আলোচনা করিবেন, তিনিই আমাদের বাক্যের সার্থকতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। উহার অংশ বিশেষেরও যদি ব্যাখ্যা করিতে যাওয়া যায়, তাহাতেও যেন ধৃষ্টতা প্রকাশ পায়। চৈত্রমাসে সন্ন্যাসীরা শঙ্কিত হইয়া অগ্নিক্রীড়া দেখাইতে যাইয়া. যেরূপ বিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের নিকট উপহাসাস্পদ হইয়াও নিরস্ত হয় না, আমাদেরও সেই দশা। যেহেতু সমগ্র শাস্ত্রমথিত এই গীতটির অংশ বিশেষের টিপ্পনী করিতে অগ্রসর হইয়াছি।

শ্রুতি ও স্মৃতিতে পঞ্চ তন্মাত্র লইয়া পঞ্চদেবতার উপাসনা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আকাশাদি চারি ভূতে পঞ্চ তন্মাত্র নাই, কিন্তু এক পৃথিবীতে পঞ্চ তন্মাত্রের কোনটীর অভাব দেখা যায় না। ইনিই কি ত্রিগুণাত্মিকা শক্তি বলিয়া নির্দ্দিষ্টা নহেন? সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণ এক এক দেবতার অসাধারণ গুণ হইলেও মহামায়া ব্যতীত ত্রিগুণ স্বরূপিণী আর কেহই নহেন! মহাভাগবতে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়।

আবার পঞ্চ তন্মাত্রের ন্যূনাতিরেকে শাক্ত বৈষ্ণবাদি উপাসকেরও বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। যেমন আকাশ তত্ত্ব প্রবল হইলে শৈব, অপ্ তত্ত্বের প্রাবল্যে বৈষ্ণব, তেজের আধিক্যে তেজোঽধিপতি সূর্য্য উপাসক এবং মরুৎ আধিক্যে গাণপত্য হইয়া থাকে। কিন্তু সত্ত্ব, রজঃ ও তমো গুণের সামঞ্জস্যে পঞ্চ তন্মাত্রময়ী শক্তি সেবক হইয়া থাকে। পঞ্চ তন্মাত্র প্রকৃতিগত বলিয়া বৈষ্ণব শৈব হইতে পারেন না এবং শৈবও শাক্ত হইতে পারেন না। তবে যদি কোন ব্যক্তির প্রকৃতির বৈলক্ষণ্য হয় তবে উপাস্যেরও বৈপরীত্য সংঘটিত হইতে পারে। সত্ত্ব, রজঃ, ও তম এই গুণত্রয়ের মধ্যে কোন একটী গুণ কেবল একক অবস্থিতি করিতে পারে না। মহাভাগবতে ৩য় স্কন্ধে, অষ্টমোঽধ্যায়ে চতুর্দ্দশ শ্লোক যথা :—"সত্ত্বং ন কেবলং কাপি ন রজো ন তমস্তথা। মিলিতাশ্চ সদা সর্ব্বে তেনান্যোঽন্যাশ্রয়াঃ স্মৃতাঃ।" প্রঃ—নিঃ—

রাগিণী বিভাষ—তাল একতালা।

সুধাই তোরে, মন! কিসেরি কারণ,
অমূল্য রতন হারালি হেলায়?
কেন কেন বল, সত্য করি বল,
না করি সম্বল, ভুলালি আমায়?
ভালবাসি তোরে, তাই কি এ ঘোরে,
ফেলে দিলি মোরে, নির্ম্মম হইয়ে?
পেলেম ভাল ফল, ভালবাসার ফল,
হইল নিষ্ফল আসিয়ে হেথায়॥
হইয়ে হতাশ দ্বিজ কালিদাস,
মাগিছে আশ্বাস, কাকুতি করিয়ে।
তুমি কর্ণধার! কর হে উদ্ধার,
কিসে হব পার, বল না উপায়॥

—০—

রাগিণী সিন্ধুভৈরবী—তাল একতালা।

করুণাময়ী নাম আমা হ'তে বুঝি ডুবে যায় গো মা।
অকৃতি সন্তানের প্রতি দয়া ত কৈ হ'ল না॥
কেন বৃথা জনমিলাম, অকলঙ্কে কালি দিলাম,
হ'য়ে কেন না মরিলাম, কিংবা জননী জঠরে—
বিনাশিতে স্ব-অসিতে, তবে কি আর এ মহীতে,
বলিত নির্দ্দয়া শ্যামা॥

জীব সকলে নিজ পুণ্য বলে, যদি হয় নিস্তার নিস্তারিণি
তবে দুর্গতিহারিণী দুর্গা, কেন বলে মা!
তোমায় সুধাই মা!
কালিদাস পুণ্যহীন, ঘুরিবে সে চিরদিন,
ইথে সে হবে না দীন, ভয় কি করে মা!
সে যে অভয়ার শ্রীচরণ, ধ্যান করে অনুক্ষণ,
মুখে বলে সদা উমা উমা ॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

অভয় পদে প্রাণ সঁপেছি।
আমি আর কি শমন ভয় রেখেছি?
কালীনাম কল্পতরু, হৃদয়ে রোপণ করেছি।
আমি দেহ বেচে, ভবের হাটে, দুর্গানাম কিনে এনেছি ॥
দেহের মধ্যে সুজন যেজন, তাঁর ঘরেতে ঘর করেছি।
এবার শমন এলে, হৃদয় খুলে, দেখাব ভেবে রেখেছি ॥
সারাৎসারা তারানাম, আপন শিখাগ্রে বেঁধেছি।
রামপ্রসাদ বলে, দুর্গা ব'লে, যাত্রা ক'রে বসে আছি ॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল যৎ।

শ্মশান ভালবাসিস্ ব'লে শশ্মান করেছি হৃদি।
শ্মশানবাসিনি! শ্যামা! নাচ্‌বি ব'লে নিরবধি

ক্রোধাদি পিশাচ যত, দিবে তাল অবিরত।
নাচ্‌বি মা তুই মনোমত, দেখবো আমি আঁখি মুদি ॥
দুঃখ-নদী তীরে চিতা, পাপ-কাষ্ঠে প্রজ্বলিতা।
শ্রদ্ধা-শিবা মুদান্বিতা, সুখের যে নাই অবধি ॥
প্রসাদেরে কৃপা করি, পুরাও আশা ক্ষেমঙ্করি!
নহিলে আমি কিসে তরি, করুণা না কর যদি ॥*

রাগিণী সাহানা—তাল কাওয়ালি।

ত্যজ মন! কুজন ভুজঙ্গ সঙ্গ।
কাল মত্ত মাতঙ্গেরে না কর আতঙ্গ ॥
অনিত্য বিষয় ত্যজ, নিত্য নিত্যময় ভজ,
মকরন্দ রসে মজ, ও রে মন ভৃঙ্গ!
স্বপ্নলভ্য রাজ্য যেমন, নিদ্রাভঙ্গে ভাব কেমন,
বিষয় জানিবে তেমন, হ'লে নিদ্রাভঙ্গ ॥
অন্ধস্কন্ধে অন্ধ চড়ে, উভয়েতে কূপে পড়ে,
কর্ম্মীকে কি কর্ম্ম ছাড়ে, কার কি প্রসঙ্গ ॥
প্রসাদ বলে কাব্য এটা, তোমাতে জন্মিল যেটা,
অঙ্গহীন হ'য়ে সেটা, বদ্ধ করে অঙ্গ ॥ †

* গীতটী অসম্পূর্ণ। ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম পংক্তি পূরণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

† নিদ্রাভঙ্গ হইলে যেরূপ স্বপ্নদৃষ্ট ভ্রম দূর হইয়া যায়, সেইরূপ আত্মতত্ত্ব বোধ হইলে

রাগিণী ললিত খাম্বাজ—তাল একতালা।

তিলেক দাঁড়াও রে শমন! বদন ভরে মাকে ডাকি রে।
আমার বিপদকালে ব্রহ্মময়ী, এসেন কি না এসেন দেখি রে॥
লয়ে যাবি সঙ্গে ক'রে, সে জন্য আর ভাবনা কি রে?
তবে তারানামের কবচ-মালা বৃথা গলায় রাখি রে॥
মহেশ্বরী আমার রাজা, আম তাঁর খাশ্ তালুকের প্রজা,
আমি কখন নাতান কখন সাতান, বাকীর দায়ে ঠেকিনা রে।
প্রাসাদ বলে, মায়ের লীলা, অন্যে কি জানিতে পারে,
যাঁর ত্রিলোচন না পেলে তত্ত্ব, আমি তত্ত্ব পাব কি রে॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মা আমার অন্তরে আছ।
তোমায় কে বলে অন্তরে শ্যামা।
তুমি পাষাণমেয়ে, বিষমমায়া, কত কাচ কাচাও মা কাচ॥
উপাসনাভেদে তুমি, প্রধান মূর্ত্তি ধর পাঁচ।
যে জন পাঁচেরে এক ক'রে ভাবে, তার হাতে
মা কোথা বাঁচ॥

বিষয়-মোহ (আমি সুখী, আমি দুঃখী) এইরূপ ভ্রম দূর হইয়া সুখ দুঃখ সমান হইয়া যায়; অঙ্গহীন (কামরিপু) অনঙ্গ হইয়াও জীবকে কি অপকর্ম্ম না করাইতেছে? ইহার উপর কাবা (অর্থাৎ বিচিত্র) কি আছে?

বুঝে ভার দেয় না যে জন, তার ভার নিতে হাঁচ।
যে জন কাঞ্চনের মূল্য জানে, সে কি ভুলে পেয়ে কাঁচ?
প্রসাদ বলে আমার হৃদয়, অমল কমল সাঁচ।
তুমি সেই সাঁচে নির্ম্মিতা হ'য়ে, মনোময়ী হয়ে নাচ॥

রাগিণী মূলতান—তাল একতালা।

কালমেঘ উদয় হ'ল, অন্তর অম্বরে।
নৃত্যতি মানস-শিখী, কৌতুকে বিহরে॥
মা শব্দে ঘন ঘন গর্জ্জে ধারা-ধরে।
তাহে প্রেমানন্দ মন্দ-হাসি, তড়িৎশোভা করে॥
নিরবধি অবিশ্রান্ত নেত্রে বারি ঝরে।
তাহে প্রাণ-চাতকের তৃষাভয়, ঘুচিল সত্বরে॥
ইহজন্ম, পরজন্ম, বহুজন্ম পরে।
রামপ্রসাদ বলে, আর জন্ম হবে না জঠরে॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মায়ের এমৃনি বিচার বটে!
যে জন দিবানিশি দুর্গা বলে, তার কপালে বিপদ ঘটে
হুজুরেতে আর্জী দিয়ে মা, দাঁড়াইয়ে আছি করপুটে।
কবে আদালত শুনানি হবে, নিস্তার পাব এ সঙ্কটে॥

সওয়াল জবাব করবো কি মা! বুদ্ধি নাইকো আমার ঘটে
ওমা ! ভরসা কেবল শিববাক্য, ঐক্য বেদাগমে রটে ॥
প্রসাদ বলে শমন ভয়ে মা ! ইচ্ছে হয় যে পলাই ছুটে :
যেন অন্তিমকালে দুর্গা ব'লে, প্রাণ ত্যজি জাহ্নবী-তটে।

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মায়ের এম্নি বিচার বটে !

যে জন দিবানিশি দুর্গা বলে,
তার কপালে কি বিপদ ঘ
মায়ের বিচার অতি সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম হ'তেও সূক্ষ্ম বটে ।
এ বিচার বুঝিতে পারে, সে বুদ্ধি কার আছে ঘটে ?
দয়াময়ী মা যে আমার, দেখে তাঁকে হৃদয়পটে ।
বুঝিলাম, বেদাগম সকলি সত্য, সত্য সত্য সত্য বটে ॥
শ্রীচরণে দিয়ে আর্জ্জী, দাঁড়ায়ে আছি করপুটে ।
হয়েছি নিশ্চিন্ত এখন, দুর্ভাবনা গেছে ছুটে ॥
কলিদাস কয় ভাবনা কি আর, পড়িলে বিষম সঙ্কটে ।
সে নয় তোমার সঙ্কট, সঙ্কট পড়িল সঙ্কটে ॥†

* বিচারালয়ে দুইজন সাক্ষীর একরূপ জবানবন্দী হইলে কেহ অবিশ্বাস করে না। বেদ ও আগমের যদি উপাস্য একরূপ হইল, তবে আর সন্দেহ কি ? এ কারণ আদালত শুনানি হইলেই নিশ্চিন্ত হইতে পারা যায়।

† কাণা পুত্রকে যেমন পদ্মলোচন বলিলে তাহার বৈপরীত্য বর্ণনা করা হয়, সেইরূপ

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মা দাঁড়ায়ে শিবের বুকে।
বেটী নাচ্‌চে আবার থেকে থেকে ॥
কি মহিমা মরি মরি, হ'য়েছে মা দিগম্বরী।
যদি অন্যে হ'ত দিগম্বরী, কত হাত চাপরি
দিত লোকে।
সতী নাম যার শুনি জন্ম, এই কি সে সতীধর্ম্ম,
জেনে শুনে শিবের মর্ম্ম, করলে কিগো চ'খে দেখে। *
মা দাঁড়ায়ে বাপের বুকে, এ কথা আর বলবো কাকে,
(তাতে) রুষ্ট নয় বাপ, তুষ্ট আছে, যেমন মিষ্টপানে
ভৃঙ্গ থাকে ॥
শ্রীরামপ্রসাদ ভণে, ক্ষেপীর মর্ম্ম ক্ষেপা জানে,
বিষের জ্বালা নিবারণে, তাই হৃদ্‌পদ্মে পদ রাখে।

রাগিণী সিন্ধু ভৈরবী—তাল পোস্তা।

যত নষ্টের যোড় ঐ বেটী তো, বেটীর বজ্জাতি সব
আগাগোড়া।
বেটীর সম্পর্কে যে একবার গেছে, তার হ'য়েছে
কপাল পোড়া ॥

"মায়ের এম্‌নি বিচার বটে" এই কথায় বিচারের শূন্যতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। এই গীতটীতে পূর্ব্ব গীতের স্পষ্টার্থ প্রতিপাদিত হইয়াছে।

* জন্মের পরে যিনি সতী নামে বিখ্যাতা তাঁহার সতীধর্ম্মের মর্ম্ম অন্যে কি বুঝিবে ?

বেটীর নাম যে নিয়ে থাকে, বেটী হাড়ে নাড়ে
জ্বালায় তাকে।
তাকে ফেলে দিয়ে ঘুর্নীপাকে, দিতে থাকে মধু মোড়া॥
বেটীর নাম, স্মরণ উচ্চারণ, ভুলেও না করে যে জন।
দেখ কেমন বেটীর আচরণ, তাকেই দেন উনি
টাকার তোড়া॥
বেটীরে না পেরে চিন্তে, যে করে ঐ বেটীর চিন্তে,
ঘুচে না তার পেটের চিন্তে, অন্নচিন্তা চমৎকারা॥
প্রসাদ দাদা ছিল ভাল, বেটীর নাম ক'রে সে
কাল ঘটাল।
তার কান্‌তে গেল চিরকাল, বেটীর নাম কেউ
নিস্ না তোরা॥
দ্বিজ কালিপদে বলে, বেটীর কি দেখছে পদতলে।
তাই পায়ে পড়ে আছে ভুলে, ঐ হাঁড়িহাবাতে
শিবে ছোঁড়া॥

রাগিণী ভৈরবী—তাল আড়াঠেকা।

মায়ের মূর্ত্তি গড়াতে চাই, মনের ভ্রমে মাটী দিয়ে
মা বেটী কি মাটীর মেয়ে, মিছে খাটী মাটী নিয়ে।
করে অসি মুণ্ডমালা, সে মা টী কি মাটীর বালা,
মাটীতে কি মনের জ্বালা, দিতে পারে নিবাইয়ে?

শুনেছি মার বরণ কালো, সে কালোতে ভুবন আলো,
মায়ের মত হয় কি কালো, মাটীতে রং মাখাইয়ে ?
মায়ের আছে তিনটী নয়ন, চন্দ্র সূর্য্য আর হুতাশন,
কোন কারিকর আছে এমন, দিবে একটী নিরমিয়ে ॥
অশিবনাশিনী কালী, সে কি মাটী খড় বিচালি ?
সে ঘুচাবে মনের কালী, প্রসাদে কালী, দেখাইয়ে ॥

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মন ! তোমার এই ভ্রম গেল না।
কালা কেমন তাই চেয়ে দেখ্‌লে না ॥
(ওরে) ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্ত্তি, জেনেও কি তাও জান না ?
জগৎকে সাজাচ্চেন যে মা, দিয়ে কত রত্ন সোণা।
(ওরে) কোন লাজে সাজাতে চাস্‌ তাঁকে, দিয়ে ছার
ডাকের গহনা ॥

জগৎকে খাওয়াচ্ছেন যে মা, সুমধুর খাদ্য নানা।
(ওরে) কোন লাজে খাওয়াইতে চাস্‌ তাঁকে, আলো
চাল আর বুট ভিজানা ॥
জগৎকে পালিছেন যে মা, সাদরে কি তা জান না ?
(ওরে) কেমনে দিতে চাস্‌ বলি, মেষ মহিষ, আর
ছাগলছানা ॥

প্রসাদ বলে ও ভোলা মন! মিছে আয়োজন আর ক'রো না।
মানসোপচারে পূজা করে কেন, তাঁরে তোষণা ॥ *

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

তাই কালো রূপ ভালবাসি।
জগন্মনোমোহিনী মা এলোকেশী ॥
কালোর গুণ ভাল জানে, শুক শম্ভু দেব ঋষি ॥
যিনি দেবের দেব মহাদেব, কালরূপ তাঁর হৃদয়বাসী ॥
কাল বরণ ব্রজের জীবন, ব্রজাঙ্গনার মন উদাসী।
হলেন বনমালী কৃষ্ণ কালী, বাঁশী ত্যজে করে অসি ॥
যতগুলি সঙ্গী মায়ের, তারা সকল এক বয়সী।
(ঐ যে) তার মধ্যে কেলে মা মোর, বিরাজে
পূর্ণিমার শশী ॥
প্রসাদ ভণে অভেদ জ্ঞানে, কাল রূপে মেশামিশি।
ওরে একে পাঁচ, পাঁচেই এক, মন করো না দ্বেষাদ্বেষী।

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

মন! তুমি কি রঙ্গে আছ?
ও মন! রঙ্গে আছ রঙ্গে আছ ॥

* এই গীতটীর ১৩শ ও ১৪শ পংক্তি পূরণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে

তোমার ক্ষণে ক্ষণে ফেরা ঘোরা, দুঃখে রোদন
সুখে নাচ ॥
রংয়ের বেলা, রাঙের কড়ি, সোণার দরে তা কিনেছ।
(ও মন!) দুঃখের বেলা রতন মাণিক, মাটীর দরে
তাই বেচেছ ॥
সুখের ঘরে রূপের বাসা, সেই রূপে মন মজায়েছ।
যখন সে রূপে বিরূপ হইবে, সে রূপের কি
রূপ ভেবেছ?
প্রসাদ বলে ও ভোলা মন! আসল বিষয় কি বুঝেছ?
প'ড়ে পাঁচের হাতে, আস্‌তে যেতে ধর্ম্ম কর্ম্ম
সব ছেড়েছ ॥*

প্রসাদী সুর—তাল একতালা।

এবার আমি ভাল ভেবেছি।
এক ভাবীর কাছে ভাব শিখেছি॥
যে দেশেতে রজনী নাই, সেই দেশের এক লোক পেয়েছি
আমার কিবা দিবা, কিবা সন্ধ্যা, সন্ধ্যাকে বন্ধ্যা করেছি
ঘুম ছুটেছে আর কি ঘুমাই, যুগে যুগে জেগে আছি।
এবার যার ঘুম তারে দিয়ে, ঘুমেরে ঘুম পাড়ায়েছি॥

* ১২শ ও ১৩শ পংক্তি পূরণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

সোহাগা গন্ধক মিশায়ে, সোণাতে রং ধরায়েছি ॥
মণি-মন্দির মেজে দিব, মনে এই আশা করেছি ॥
প্রসাদ বলে ভক্তি মুক্তি, উভয়কে মাথে ধরেছি।
এবার শ্যামার নাম ব্রহ্ম জেনে, ধর্ম্ম কর্ম্ম সব ছেড়েছি

রাগিণী ঝিঝিট,—তাল যৎ।

আর কেন ভয় দেখাও তারা, আমি ভয়ে ভুলিবার
ছেলে নই।
সুখদা জননী মম, আরও মাতা ব্রহ্মময়ী ॥
জনক ব্রজমোহন গুণেতে বিশ্বমোহন,
যিনি হন ফণিভূষণ তাঁরও আমি পুত্র হই ॥
হরিপুর জন্মস্থান, সেত হয় স্বর্গ সমান,
মার চরণে পেলে স্থান, আর কি আমি কোথাও রই?
দ্বিজ কালিদাসে কয়, ভয়হারিণীর হ'য়ে তনয়,
কেন আমি পাব ভয়, মা তোমারে নিগূঢ় কই ॥

গীত রচয়িতা নিদ্রাবেশে ভয় পাইয়া ভয়দাত্রী ভয়হারিণীকে এই নিগূঢ় তত্ত্ব বিজ্ঞাপিত করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন।

জননীর রাজ্যে আর কিছু নয়, কখন ভয়ে ভুলি না। কখন বা সভয়ে সশঙ্কিত হ'য়ে বিচরণ করি, কারণ অঘটন পটীয়সী কখন কি ঘটান, তাহা যে শিবেরও দুর্ব্বোধ্য, নচেৎ দশমহাবিদ্যার আবির্ভাব হইবে কেন? ত্রিলোচন না পেলে তত্ত্ব আমি তত্ত্ব পাব কি রে?

রাগিণী ঝিঁঝিট,—পোস্তা।

(ওমা) অভয়ে! ডাকি সভয়ে।
কৃপা কর কৃপাময়ী এ দীনেরে ভব-ভয়ে॥
বাল্য গেল ধূলাখেলায়, যৌবন গত ভোগ বাসনায়,
শেষ বয়সে হায় হায়, ইন্দ্রিয় সব গেল ব'য়ে॥
জনম মরণ যে যাতনা, তুমি ত মা তা জান না,
তাই বলি মা! আর দিও না, কত কাল আর থাক্‌ব স'য়ে?
চৌরাশি লক্ষ জনম পরে, মানব দেহ পুনঃ ধরে,
আবার কি মা যাব ফিরে, কালিদাস কয় কাতর হ'য়ে॥

দশ মহাবিদ্যা স্তব।

মহাবিদ্যা কালী তারা, এই নাম জপে যারা,
সর্ব্বসিদ্ধি হস্তগত তার।
ষোড়শী ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী জগদীশ্বরী,
সিদ্ধবিদ্যা ছিন্নমস্তা আর॥
সিদ্ধবিদ্যা ধূমাবতী, আদ্যাশক্তি ভগবতী,
ভয় হয় বৈধব্য দর্শনে।
শঙ্কর যাহাতে ভীত, মা বলিয়ে অশঙ্কিত,
কি আশ্চর্য্য দেখ ভক্ত-জনে॥

জপে যে বগলা-নাম, সিদ্ধ তার মনস্কাম,
সিদ্ধবিদ্যা নাম সে কারণ।
মাতঙ্গিনী মহাবিদ্যা, সুরাসুর নরারাধ্যা
কমলা কমল নিকেতন॥
এই দশ মহাবিদ্যা, তন্ত্রে বলে সিদ্ধবিদ্যা
সিদ্ধিদাত্রী জীব সকলের।
ধন্য হয় সেই জন, জপ করে অনুক্ষণ
শিব বাক্য উক্ত আগমের॥
দশদিক দেখি শূন্য, কালিদাস হ'য়ে ক্ষুণ্ণ
ভাবিতেছে করি কি এখন।
কৃপা করি ক্ষেমঙ্করী দশবিধ রূপ ধরি
হৃদয়েতে দিল দরশন॥
মিটিল মনের আশ, মহোল্লাসে কালিদাস
তারা তারা বুলি সদা বলে।
দুস্তর ভব সংসার, মহাবিদ্যা কর্ণধার
যাও সবে নিজগৃহালে চ'লে॥

পরিশিষ্ট।

পৌরাণিক বাক্য।

ত্রিকালদর্শী ঋষি প্রণীত গ্রন্থ পাঠ করিলে জানিতে পারা যায় যে, পূর্ণ কলিকালে ধর্ম্মবর্জ্জিত পাপপরায়ণ কর্ম্মভূমি ভারতবাসী মনুষ্যগণ খাদ্যদ্রব্য, ঔষধ ও ধর্ম্ম কার্য্যাদিতে বঞ্চিত হইবে। ১৩ বৎসর গত হইল কলি-সন্ধিকাল পাঁচ হাজার বৎসর অতীত হইয়া পূর্ণ কলি প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। যদিও কলি প্রারম্ভে বঞ্চনার সৃষ্টি হইয়াছে বটে, কিন্তু বঞ্চনার প্রাদুর্ভাব এই কয় বৎসর পূর্ণমাত্রায় দেখা যাইতেছে। বিশেষতঃ রোগপীড়িত ব্যক্তিদিগের লাঞ্ছনা অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। এজন্য আমরা "বিজ্ঞাপন-বিভ্রাট্" নামক প্রবন্ধে বঞ্চনার ছবি প্রকটিত করিলাম। ইহা পাঠ করিলে সহৃদয় ব্যক্তিগণ বঞ্চনার মর্ম্ম সম্যক্‌রূপ উপলব্ধি করিতে পারিবেন। এবং "কালো হি বলবত্তরঃ" এই মহাবাক্যের সার্থকতা বুঝিতে পারিয়া প্রীত হইবেন।

বিজ্ঞাপন-বিভ্রাট

প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য ভাবে অনুকরণপ্রিয়তা প্রায় সকল ব্যক্তির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। উন্নতিশীল দেশের সুপদ্ধতিগুলি বিশেষরূপে আয়ত্ত করিতে পারিলে যে সুফল হয়, তাহা কাহারও অবিদিত নহে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, আমাদের দেশে পাশ্চাত্য পদ্ধতিগুলি বিকৃত ভাবে অনুসৃত হওয়ায় ব্যবসায়ী ও অন্যান্য ব্যক্তিদিগের মধ্যে অতিশয় অসুবিধা হইয়া উঠিয়াছে। বিজ্ঞাপন দ্বারা ব্যবসা চালান আমাদের দেশের পদ্ধতি না হইলেও বর্ত্তমান সময়ে বিজ্ঞাপনই যেন ব্যবসার জীবন হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এই সমস্ত বিজ্ঞাপন যদি প্রবঞ্চনা-পূর্ণ না হইত, তাহা হইলে সকলকার পক্ষেই সুবিধা হইত।

রাবণ ছলনা দ্বারা সীতাকে হরণ করিয়া নারদের নিকট গর্ব্ব প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, তুমি আমার নিকট রামচন্দ্রকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলে; সেই রামচন্দ্রকে আমি মায়াদ্বারা মুগ্ধ করিয়া সীতাকে হরণ করিয়া আনিয়াছি। এখন আমার প্রভাব তোমার মুখে কীর্ত্তন হইলে ভাল হয় না কি? প্রত্যুত্তরে সুচতুর মহর্ষি নারদ নানা কথার প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন,—"মনুষ্যদেহধারী রামচন্দ্র রাক্ষসীমায়ায় মুগ্ধ হইয়া নিন্দিত হন্ নাই, কিন্তু সন্ন্যাসিবেশ ধারণ করিয়া ছলনা দ্বারা সীতাকে হরণ করিয়া, সন্ন্যাসীদিগের উপরে সাধারণের বিশ্বাস তুমি নষ্ট করিলে; ইহা তোমার বড়ই অপকীর্ত্তি হইয়াছে। কারণ কল্যকার খাইবার সংস্থান করা সন্ন্যাসীদিগের পক্ষে নিষিদ্ধ; এ কারণ তাঁহারা সঞ্চয়ী না হইলেও সকলের বিশ্বাসভাজন বলিয়া তাঁহাদিগের খাদ্য সংগ্রহ করিতে কোন প্রকার কষ্ট হয় না। এখন হইতে সন্ন্যাসী দেখিলে

তোমার কপটতা স্মরণ করিয়া আর কেহ সন্ন্যাসীকে বিশ্বাস করিবে না। এখন কি তোমার এই দুষ্কীর্ত্তি আমাকে কীর্ত্তন করিতে হইবে?" এখনকার দিনে সেইরূপ তপস্বিবেশধারী ব্যবসায়ী রাবণ জটাজুট কমণ্ডলু (জাল প্রশংসাপত্র) গ্রহণ করিয়া সকল ব্যক্তির নিকট ধনরূপ সীতা হরণের নিমিত্ত সময়ে সময়ে উপস্থিত হইয়া থাকেন; ইহা কি রোগপীড়িত ব্যক্তিদিগের পক্ষে বিশেষ বিপত্তিজনক নহে?

পূর্ব্বে স্বদেশে থাকিয়া অনেকেই জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন, সে সময়ে স্ব স্ব দেশের মান্যগণ্য ব্যক্তিগণ যে পথে যাইতেন, অধিকাংশ ব্যক্তি সেই পথ অনুসরণ করিয়া কেহই বঞ্চিত হইতেন না। এখন তাঁহাদিগের বংশধরেরা অর্থোপার্জ্জনের নিমিত্ত দূরদেশে অবস্থিতি করিতেছেন। সেই সমস্ত ব্যক্তি আপৎকালে (কোন পীড়া উপস্থিত হইলে) বিজ্ঞাপনের উপর নির্ভর না করিলে আর গত্যন্তর কি? ইহাই হইয়াছে বঞ্চকদিগের সুযোগ। তবে আমরা বহু দিন কলিকাতায় থাকিয়া ইহাও নিয়ত প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি যে, কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি সেই সমস্ত বঞ্চকের প্রবঞ্চনাজালে পতিত হন না। অধিকন্তু অনেকে আমাদিগের নিকট আসিয়া ঐ সমস্ত প্রবঞ্চনার কথা বলিয়া, বঞ্চকদিগের বিজ্ঞাপনের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া থাকেন।

এই সমস্ত অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বিজ্ঞাপন পাঠে বঞ্চকদিগের চতুরতা বুঝিয়া আর তাহাতে বিশ্বাসস্থাপন করেন না। তাঁহাদের অভিজ্ঞতাই বলিয়া দেয় যে, এত অল্প মূল্যের ঔষধে যদি অশেষ প্রকার ব্যাধির উপশম হয়, তবে এত আড়ম্বরপূর্ণ বিজ্ঞাপনই বা কেন? সেই ঔষধের সুফল ও মূল্যের অল্পতা দেখিয়া সকলে আগ্রহসহকারে বিনা বিজ্ঞাপনেই লইবে। যখন এত আড়ম্বরপূর্ণ বিপুল বিজ্ঞাপন খরচা করিয়াও সুলভ মূল্যে ঔষধ দিতেছে তখন ইহা কখনই প্রকৃত ঔষধ নহে। এই বিশ্বাসে

নির্ভর করিয়া তাঁহারা বঞ্চিত হয়েন না। কিন্তু যাঁহারা সরল বিশ্বাসে জাল প্রশংসাপত্র দেখিয়া ভুলিয়া যান, তাঁহাদিগের জন্যই আমাদের এই উদ্যম। যাহাদিগের আর্থিক অবস্থা ভাল নহে, অথচ উৎকট রোগ যন্ত্রণায় ছট্‌ফট করিতেছে, তাহারা স্বল্প মূল্যে যন্ত্রণানাশক ঔষধের জাল প্রশংসাপত্র সহ মনোমুগ্ধকর বিজ্ঞাপন দেখিয়া সেই ঔষধ গ্রহণ না করিয়া কি প্রকারে স্থির থাকিতে পারে? কিন্তু এই সকল বঞ্চকদিগের ঔষধে কেবল যে অর্থ নষ্ট হয় তাহা নহে, দেহের ক্ষতিও বিলক্ষণ হইয়া থাকে।

এজন্য আয়ুর্ব্বেদবিদ পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন, খাদ্যভ্রমে বিষমিশ্র অন্ন পান অপেক্ষা ক্ষুধার্ত্ত থাকা যেরূপ শ্রেয়স্কর, সেইরূপ মূর্খ বৈদ্যের চিকিৎসিত না হওয়া শুভকর। ক্ষুধার্ত্তের কালে যেরূপ অন্ন মিলিবার সম্ভাবনা আছে, রোগার্ত্তের রোগও সেইরূপ কালক্রমে বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা আছে। ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তি বিষপান করিলে জীবনের আশায় বঞ্চিত হয়, সেইরূপ বঞ্চক মূর্খ বৈদ্যের চিকিৎসিত রোগী ও আরোগ্য আশাও প্রাণ সেইরূপ অপহৃত হইয়া থাকে। এই সকল সরল বিশ্বাসী ব্যক্তিগণের প্রতি আমাদের বক্তব্য এই যে, তাঁহারা যেন বঞ্চকদিগের জাল প্রশংসাপত্র ও বিজ্ঞাপন দেখিয়া সুলভ মূল্যের অশাস্ত্রীয় ঔষধগুলি ব্যবহার না করেন।